BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

ছায়াসঙ্গী

হুমায়ূন আহমেদ

ছায়াসঙ্গী

হুমায়ূন আহমেদ

অন্বেষা প্রকাশন

www.BDeBooks.Com

ছায়াসঙ্গী
হুমায়ূন আহমেদ

স্বত্ব © মেহের আফরোজ শাওন

দ্বিতীয় মুদ্রণ
মে ২০১০

প্রথম অন্বেষা সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১০
অন্বেষা ১১৮

প্রকাশক
মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন
অন্বেষা প্রকাশন
লিয়াকত প্লাজা
৯ বাংলাবাজার ঢাকা
ফোন : ৭১২৪৯৮৫, ০১৯১১৩৯৪৯১৭

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

ক্রিয়েটিভ এ্যাডভাইজার
ওয়াহিদ ইবনে রেজা

অক্ষর বিন্যাস
দিনরাত্রি কম্পিউটার

মুদ্রণ
ঐশী প্রিন্টার্স
পুরানা পল্টন লেন, ঢাকা

যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক
মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক

যুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন

মূল্য : ১৬০.০০ টাকা মাত্র

Chayasongi by Humayun Ahmed
First Annesha Edition February Book Fair 2009
Mohammed Shahadat Hossain
Annesha Prokashon, 9 Banglabazar, Dhaka.

www.anneshaprokashon.com
E-mail annesha_prokashon@yahoo.com
Price : Tk. 160.00 only **US $ 7.00**
ISBN 984 70116 0068 0 Code 118

উৎসর্গ

আলমগীর রহমান
যিনি ভূত বিশ্বাস করেন না তবে
ভূতের গল্প শুনলে ভয়ে রাতে ঘুমুতে পারেন না

www.BDeBooks.Com

তাহার ধূসর ঘোড়া চরিতেছে নদীর কিনারে
কোনো এক বিকেলের জাফরান দেশে।
কোকিল কুকুর জ্যোৎস্না ধুলো হ'য়ে গেছে কত ভেসে।
মরণের হাত ধ'রে স্বপ্ন ছাড়া কে বাঁচিতে পারে?

জীবনানন্দ দাশ

পূর্বকথা

আপনি কি ভূত বিশ্বাস করেন ?

আমাকে অনেকেই এই প্রশ্ন করেছেন, আমি মজা করার জন্যে প্রতিবারই বলেছি— ভূত-প্রেত বিশ্বাস করি তবে মানুষ বিশ্বাস করি না।

উত্তর ঠিক না। কোনো অতিপ্রাকৃত ব্যাপারে আমার বিশ্বাস নেই। চল্লিশ বছর পার করে দিয়েছি, এখন পর্যন্ত ভূত দেখার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য কোনোটাই হয়নি। আমার অতিপরিচিত কেউও ভূত দেখেছেন বলে আমার জানা নেই। তা হলে হঠাৎ করে ভূতের গল্প লিখতে বসলাম কেন ?

আসলে গল্পগুলি ঠিক ভূতের নয়— অন্যরকম অভিজ্ঞতার গল্প, যে-অভিজ্ঞতা আমাদের প্রায় সবারই আছে এবং যা চট করে ব্যাখ্যা করা যায় না। উদাহরণ দিই— ছোটবেলায় মরিয়ম বলে আমাদের একটা কাজের মেয়ে ছিল। বয়স বারো-তেরো। অসম্ভব বোকা। তার ঘুম ছিল প্রবাদের মতো। বাথরুমে কাপড়ে সাবান মাখাতে মাখাতে ঘুমিয়ে পড়ত, চুলায় চায়ের কেতলি বসিয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। এই মেয়েটা কোনো-এক বিচিত্র উপায়ে ভবিষ্যৎ বলত। ঘর ঝাঁট দিতে দিতে হঠাৎ হয়তো বলল, আইজ আমরার বাসাত বুড়া কিসিমের একটা লোক আসব, সাথে ছোট মাইয়া। লোকটার শইল্যে হইলদা জামা।

সত্যি সত্যি তা-ই হতো। মরিয়ম ভবিষ্যদ্বাণী করেছে অথচ তা হয়নি এই নজির নেই। ভবিষ্যদ্বাণীগুলি কীভাবে করত তা সে নিজেও জানে না। প্রশ্ন করলে বলত— চউক্ষের সামনে দেহি। ক্যামনে দেহি জানি না।

আমাদের পরিবারে একটি বড় দুর্ঘটনার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করার পর এবং সেই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে-অক্ষরে মিলে যাবার পর তাকে ছাড়িয়ে দেয়া হয়। এই পৃথিবীতে যুক্তিগ্রাহ্য নয় এমন বিষয়ও যে ঘটে তা মরিয়মকে দেখেই আমি প্রথম বুঝতে পারি।

www.BDeBooks.Com

অবিশ্যি এটা স্বীকার করে নেয়া ভালো যে— আজকের বিজ্ঞান যা ব্যাখ্যা করতে পারছে না আগামীদিনের বিজ্ঞান তা পারবে। হয়তো মরিয়মের ভবিষ্যৎ বলতে পারার যে-ক্ষমতাকে আমাদের কাছে অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা বলে মনে হচ্ছে, আসলে তা মোটেই নয়। হয়তো আগামীদিনের বিজ্ঞান সময়কে জয় করবে। তখন ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান বলে আলাদা কিছু থাকবে না।

আমি লক্ষ করেছি খুব সহজে অধিকাংশ ভৌতিক অভিজ্ঞতারই লৌকিক ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায়। ছোটবেলায় আমি আমার নানুর কাছ থেকে তাঁর জীবনের একটা ভয়াবহ ভৌতিক অভিজ্ঞতার গল্প শুনতাম। সেই সময় গল্প শুনে ভয়ে ও আতঙ্কে অস্থির হয়েছি। এখন মনে হচ্ছে আমার মাতামহীর অভিজ্ঞতার একটি সহজ ব্যাখ্যা আছে, সেই ব্যাখ্যা খুব খারাপ না।

আবার কিছু-কিছু গল্প এমন যে তার কোনো ব্যাখ্যাই দাঁড় করানো যায় না। আমি নানানভাবে চেষ্টা করেও কিছু পাইনি। হয়তো আমার বুদ্ধিবৃত্তি তত উন্নত নয়। এইজাতীয় ঘটনার মুখোমুখি এলে থমকে দাঁড়ানো ছাড়া পথ নেই। আমি অনেকবার থমকে দাঁড়িয়েছি। আমার মনে হয়েছে আমাদের আলোকিত জগতের পাশাপাশি একটি অন্ধকার জগৎও আছে। সেই জগতের নিয়মকানুন ভিন্ন।

আমি এই গল্প সংকলনে অন্ধকার জগতের কিছু কথা বলার চেষ্টা করেছি। বেশির ভাগই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গল্প। কিছু বাইরের গল্পও আছে, তার মালমশলা আমার অতি প্রিয়জনদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা। মানুষকে ভয় দেখানোর জন্যে, কিংবা অন্য ভুবন সম্পর্কে কোনো ধারণা দেবার জন্যে গল্পগুলি লেখা হয়নি। লিখেছি এই পৃথিবীর রহস্যময় ব্যাপারগুলির দিকে ইঙ্গিত করার জন্যে। লেখাগুলি গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ না করার জন্যেই বলব।

আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি ব্যাখ্যার অতীত কিছুই নেই। আমি ব্যাখ্যা করতে পারছি না, তা আমার অক্ষমতা, অন্য কেউ করবেন।

হুমায়ূন আহমেদ
শহীদুল্লাহ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

ছায়াসঙ্গী	১১
শবযাত্রা	২১
ওইজা বোর্ড	৩৫
সে	৫২
দ্বিতীয়জন	৬৫
বেয়ারিং চিঠি	৭৬
বীণার অসুখ	৮৩
কুকুর	৯৪
ভয়	১০৩

www.BDeBooks.Com

ছায়াসঙ্গী

প্রতি বছর শীতের ছুটির সময় ভাবি কিছুদিন গ্রামে কাটিয়ে আসব। দলবল নিয়ে যাব— হইচই করা যাবে। আমার বাচ্চারা কখনো গ্রাম দেখেনি–তারা খুশি হবে। পুকুরে ঝাঁপাঝাঁপি করতে পারবে। শাপলা ফুল শুধু যে মতিঝিলের সামনেই ফোটে না, অন্যান্য জায়গাতেও ফোটে তাও স্বচক্ষে দেখবে।

আমার বেশির ভাগ পরিকল্পনাই শেষ পর্যন্ত কাজে লাগাতে পারি না। এটা কেমন করে জানি লেগে গেল। একদিন সত্যি সত্যি রওনা হলাম।

আমাদের গ্রামটাকে অজপাড়াগাঁ বললেও সম্মান দেখানো হয়। যোগাযোগ-ব্যবস্থার এমন সুন্দর সময়েও সেখানে পৌঁছতে হয় গরুর গাড়িতে। বর্ষার সময় নৌকা, তবে মাঝখানে একটা হাওর পড়ে বলে সেই যাত্রা অগস্ত্যযাত্রার মতো।

অনেকদিন পর গ্রামে গিয়ে ভালো লাগল। দেখলাম আমার বাচ্চাদের আনন্দবর্ধনের সব ব্যবস্থাই নেয়া হয়েছে। কোত্থেকে যেন একটা হাড়জিরজিরে বেতো ঘোড়া জোগাড় করা হয়েছে। এই ঘোড়া নড়াচড়া করে না, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। খুব বেশি বিরক্ত হলে দীর্ঘনিশ্বাসের মতো একটা শব্দ করে এবং লেজটা নাড়ে। বাচ্চারা এতবড় একটা জীবন্ত খেলনা পেয়ে মহাখুশি। দু-তিনজন একসঙ্গে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে থাকে।

তাদের অসংখ্য বন্ধু-বান্ধবও জুটে গেল। যেখানেই যায় তাদের সঙ্গে গোটা পঞ্চাশেক ছেলেপুলে থাকে। আমার বাচ্চারা যা করে তাতেই তারা চমৎকৃত হয়। আমার বাচ্চারা তাদের বিপুল জনপ্রিয়তায় অভিভূত। তারা

তাদের যাবতীয় প্রতিভা দেখাতে শুরু করল–কেউ কবিতা বলছে, কেউ গান, কেউ ছড়া।

আমি একগাদা বই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার পরিকল্পনা— পুরোপুরি বিশ্রাম নেয়া। শুয়ে বসে বই পড়া, খুব বেশি ইচ্ছা করলে খাতা-কলম নিয়ে বসা। একটা উপন্যাস অর্ধেকের মতো লিখেছিলাম, বাকিটা কিছুতেই লিখতে ইচ্ছা করছিল না। পাণ্ডুলিপি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। নতুন পরিবেশে যদি লিখতে ইচ্ছা করে।

প্রথম কিছুদিন বই বা লেখা কোনোটাই নিয়ে বসা গেল না। সারাক্ষণই লোকজন আসছে। তারা অত্যন্ত গম্ভীর গলায় নানান জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনায় উৎসাহী। এসেই বলবে— 'দেশের অবস্থাডা কী কন দেহি ছোডমিয়া। বড়ই চিন্তাযুক্ত আছি। দেশের হইলডা কী ? কী দেশ ছিল আর কী হইল।'

দিন চার-পাঁচেকের পর সবাই বুঝে গেল দেশ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। গল্পগুজবও তেমন করতে পারি না। তারা আমাকে রেহাই দিল। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। গ্রামের নতুন পরিবেশের কারণেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক, আমি লেখালেখির প্রবল আগ্রহ বোধ করলাম। অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি নিয়ে বসলাম। সারাদিন লেখালেখি কাটাকুটি করি, সন্ধ্যায় স্ত্রীকে সঙ্গে করে বেড়াতে বের হই। চমৎকার লাগে। প্রায় রাতেই একজন দুজন করে 'গাতক' আসে। এরা জ্যোৎস্নাভেজা উঠোনে বসে চমৎকার গান ধরে—

'ও মনা
এই কথাটা না জানলে প্রাণে বাঁচতাম না।
না না না— আমি প্রাণে বাঁচতাম না।'

সময়টা বড় চমৎকার কাটতে লাগল। লেখার ব্যাপারে আগ্রহ বাড়তেই লাগল। সারাদিনই লিখি।

এক দুপুরের কথা— একমনে লিখছি। জানালার ওপাশে খুট করে শব্দ হলো। তাকিয়ে দেখি খালিগায়ে রোগামতো দশ-এগারো বছরের একটা ছেলে গভীর আগ্রহে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওকে আগেও দেখেছি। জানালার ওপাশ থেকে গভীর কৌতূহলে সে আমাকে দেখে। চোখে চোখ পড়লেই পালিয়ে যায়। আজ পালাল না।

আমি বললাম— কী রে ?

সে মাথাটা চট করে নামিয়ে ফেলল।

www.BDeBooks.Com

আমি বললাম— চলে গেলি নাকি ?

ও আড়াল থেকে বলল— না।

'নাম কী রে তোর ?'

'মস্তাজ মিয়া।'

'আয় ভেতরে আয়।'

'না।'

আর কোনো কথাবার্তা হলো না। আমি লেখায় ডুবে গেলাম। ঘুঘুডাকা শ্রান্ত দুপুরে লেখালেখির আনন্দই অন্যরকম। মস্তাজ মিয়ার কথা ভুলে গেলাম।

পরদিন আবার এই ব্যাপার। জানালার ওপাশে মস্তাজ মিয়া। বড় বড় কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে। আমি বললাম–কী ব্যাপার মস্তাজ মিয়া ? আয় ভেতরে।

সে ভেতরে ঢুকল।

আমি বললাম, থাকিস কোথায় ?

উত্তরে পোকা-খাওয়া দাঁত বের করে হাসল।

'স্কুলে যাস না ?'

আবার হাসি। আমি খাতা থেকে একটা সাদা কাগজ ছিঁড়ে তার হাতে দিলাম। সে তার এই বিরল সৌভাগ্যে অভিভূত হয়ে গেল। কী করবে বুঝতে পারছে না। কাগজটার গন্ধ শুঁকল। গালের উপর খানিকক্ষণ চেপে রেখে উল্কার বেগে বেরিয়ে গেল।

রাতে খেতে খেতে আমার ছোট চাচা বললেন— মস্তাজ হারামজাদা তোমার কাছে নাকি আসে ? এলে একটা চড় দিয়ে বিদায় করবে।

'কেন ?'

'বিরাট চোর। যা-ই দেখে তুলে নিয়ে যায়। ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেবে না। দুই দিন পরপর মার খায় তাতেও হুঁশ হয় না। তোমার এখানে এসে করে কী ?'

'কিছু করে না।'

'চুরির সন্ধানে আছে। কে জানে এর মধ্যে হয়তো তোমার কলম-টলম নিয়ে নিয়েছে।'

'না, কিছু নেয়নি।'

'ভালো করে খুঁজে-টুজে দ্যাখো। কিছুই বলা যায় না। ঐ ছেলের ঘটনা আছে।'

'কী ঘটনা ?'

'আছে অনেক ঘটনা। বলব একসময়।'

পরদিন সকালে যথারীতি লেখালিখি শুরু করেছি। হইচই শুনে বের হয়ে এলাম। অবাক হয়ে দেখি মস্তাজ মিয়াকে তিন-চারজন চ্যাংদোলা করে নিয়ে এসেছে। ছেলেটা ফোঁপাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে প্রচণ্ড মার খেয়েছে। ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়ছে। একদিকের গাল ফুলে আছে।

আমি বললাম, কী ব্যাপার ?'

শাস্তিদাতাদের একজন বলল, দেখেন তো এই কলমটা আপনের কি না। মস্তাজ হারামজাদার হাতে ছিল।

দেখলাম কলমটা আমারই, চার-পাঁচ টাকা দামের বলপয়েন্ট। এমন কোনো মহার্ঘ বস্তু নয়। আমার কাছে চাইলেই দিয়ে দিতাম। চুরি করার প্রয়োজন ছিল না। মনটা একটু খারাপই হলো। বাচ্চা বয়সে ছেলেটা এমন চুরি শিখল কেন ? বড় হয়ে এ করবে কী ?

'ভাইসাব, কলমটা আপনার ?'

'হ্যাঁ। তবে আমি এটা ওকে দিয়ে দিয়েছি। ছেড়ে দিন। বাচ্চা ছেলে এত মারধোর করেছেন কেন ? মারধোর করার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করে নেবেন না ?'

শাস্তিদাতা নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, এই মাইরে ওর কিছু হয় না। এইডা এর কাছে পানিভাত। মাইর না খাইলে এর ভাত হজম হয় না।'

মস্তাজ মিয়া বিস্মিত চোখে আমাকে দেখছে। তাকে দেখেই মনে হলো সে তার ক্ষুদ্র জীবনে এই প্রথম একজনকে দেখছে যে চুরি করার পরও তাকে চোর বলেনি। মস্তাজ মিয়া নিঃশব্দে বাকি দিনটা জানালার ওপাশে বসে রইল। অন্যদিন তার সঙ্গে দুএকটা কথাবার্তা বলি, আজ একটা কথাও বলা হলো না। মেজাজ খারাপ হয়েছিল। এই বয়সে একটা ছেলে চুরি শিখবে কেন ?

মস্তাজ মিয়ার যে একটা বিশেষ ঘটনা আছে তা জানলাম আমার ছোট চাচির কাছে। চুরির ঘটনারও দুদিন পর। গ্রামের মানুষদের এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার। কোন ঘটনা যে গুরুত্বপূর্ণ, কোনটা তুচ্ছ তা এরা বুঝতে পারে না। মস্তাজ মিয়ার জীবনের এত বড় একটা ব্যাপার কেউ আমাকে এতদিন বলেনি, অথচ তুচ্ছ সব বিষয় অনেকবার করে শোনা হয়ে গেছে। মস্তাজ মিয়ার ঘটনাটা এই—

www.BDeBooks.Com

তিন বছর আগে কার্তিক মাসের মাঝামাঝি মস্তাজ মিয়া দুপুরে প্রবল জ্বর নিয়ে বাড়ি ফেরে। সেই জ্বরের প্রকোপ এতই বেশি যে শেষ পর্যন্ত মস্তাজ মিয়ার হতদরিদ্র বাবা একজন ডাক্তারও নিয়ে এলেন। ডাক্তার আনার কিছুক্ষণের মধ্যেই মস্তাজ মিয়া মারা গেল। গ্রামে জন্ম এবং মৃত্যু দুটোই বেশ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা হয়। মস্তাজ মিয়ার মা কিছুক্ষণ চিৎকার করে কাঁদল। তার বাবাও খানিকক্ষণ 'আমার পুত কই গেলরে' বলে চেঁচিয়ে স্বাভাবিক হয়ে গেল। বেঁচে থাকার প্রবল সংগ্রামে তাদের লেগে থাকতে হয়। পুত্রশোকে কাতর হলে চলে না।

মরা মানুষ যত তাড়াতাড়ি কবর দিয়ে দেয়া হয় ততই নাকি সোয়াব এবং কবর দিতে হয় দিনের আলো থাকতে থাকতে। কাজেই জুম্মাঘরের পাশে বাদ আছর মস্তাজ মিয়ার কবর হয়ে গেল। সবকিছুই খুব স্বাভাবিকভাবে।

অস্বাভাবিক ব্যাপারটা শুরু হলো দুপুর রাতের পর, যখন মস্তাজ মিয়ার বড় বোন রহিমা কলমাকান্দা থেকে উপস্থিত হলো। কলমাকান্দা এখান থেকে একুশ মাইল। এই দীর্ঘ পথ একটি গর্ভবতী মহিলা পায়ে হেঁটে চলে এল এবং বাড়িতে পা দিয়েই চেঁচিয়ে বলল, তোমরা করছ কী ? মস্তাজ বাঁইচ্যা আছে। কবর খুঁইড়া তারে বাইর কর। দিরং করবা না।

বলাই বাহুল্য, কেউ তাকে পাত্তা দিল না। শোকে-দুঃখে মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যায়। কবর দিয়ে দেয়ার পর নিকট আত্মীয়-স্বজনরা সবসময় বলে–'ও মরে নাই।' কিন্তু মস্তাজ মিয়ার বোন রহিমা এই ব্যাপারটা নিয়ে এতই হইচই শুরু করল যে সবাই বাধ্য হলো মৌলানা সাহেবকে ডেকে আনতে।

রহিমা মৌলানা সাহেবের পায়ে গিয়ে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, মস্তাজ বাঁইচ্যা আছে— আপনে এরে বাঁচান। আপনে না বললে কবর খুঁড়ত না। আপনে রাজি না হওয়া পর্যন্ত আমি পাও ছাড়তাম না। মৌলানা সাহেব অনেক চেষ্টা করেও রহিমাকে ঝেড়ে ফেলতে পারলেন না। রহিমা বজ্রআঁটুনিতে পা ধরে বসে রইল।

মৌলানা সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন— বাঁইচ্যা আছে বুঝলা ক্যামনে ? রহিমা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আমি জানি।

গ্রামের মৌলানারা অতি কঠিন হৃদয়ের হয় বলে আমাদের একটা ধারণা আছে। এই ধারণা সত্যি নয়। মৌলানা সাহেব বললেন— প্রয়োজনে কবর দ্বিতীয়বার খোঁড়া জায়েজ আছে। এই মেয়ের মনের শান্তির জন্যে এটা করা যায়। হাদিস শরীফে আছে...

কবর খোঁড়া হলো।

ভয়াবহ দৃশ্য!

মস্তাজ মিয়া কবরের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে। পিটপিট করে তাকাচ্ছে। হঠাৎ চোখে প্রবল আলো পড়ায় চোখ মেলতে পারছে না। কাফনের কাপড়ের একখণ্ড লুঙ্গির মতো পেঁচিয়ে পরা। অন্য দুটি খণ্ড সুন্দর করে ভাঁজ করা।

অসংখ্য মানুষ জমা হয়ে আছে। এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে কারো মুখে কোনো কথা সরল না। মৌলানা সাহেব বললেন— কীরে মস্তাজ ?

মস্তাজ মৃদুস্বরে বলল, পানির পিয়াস লাগছে।

মৌলানা সাহেব হাত বাড়িয়ে তাকে কবর থেকে তুললেন।

এই হচ্ছে মস্তাজ মিয়ার গল্প। আমি আমার এই জীবনে অদ্ভুত গল্প অনেক শুনেছি, এরকম কখনো শুনিনি।

ছোট চাচাকে বললাম, মস্তাজ তারপর কিছু বলেনি ? অন্ধকার কবরে জ্ঞান ফিরবার পর কী দেখল না-দেখল এইসব ?

ছোট চাচা বললেন— না। কিচ্ছু কয় না। হারামজাদা বিরাট বজ্জাত।

'জিজ্ঞেস করেননি কিছু ?'

'কতজনে কত জিজ্ঞেস করছে। এক সাংবাদিকও এসেছিল। ছবি তুলল। কত কথা জিজ্ঞেস করল— একটা শব্দ করে না। হারামজাদা বদের হাড্ডি।'

আমি বললাম, কবর থেকে ফিরে এসেছে— লোকজন তাকে ভয়-টয় পেত না ?

'প্রথম প্রথম পাইত। তারপর আর না। আল্লাহ্তায়ালার কুদরত। আল্লাহ্তায়ালার কেরামতি আমরা সামান্য মানুষ কী বুঝব কও ?'

'তা তো বটেই। আপনারা তার বোন রহিমাকে জিজ্ঞেস করেননি, সে কী করে বুঝতে পারল মস্তাজ বেঁচে আছে ?'

'জিজ্ঞেস করার কিছু নাই। এইটাও তোমার আল্লাহ্র কুদরত। উনার কেরামতি।'

ধর্মকর্ম করুক বা না-করুক গ্রামের মানুষদের আল্লাহ্তায়ালার 'কুদরত' এবং 'কেরামতির' ওপর অসীম ভক্তি। গ্রামের মানুষদের চরিত্রে চমৎকার সব দিক আছে। অতি তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে এরা প্রচুর মাতামাতি করে, আবার অনেক বড় বড় ঘটনা হজম করে। দার্শনিকের মতো গলায় বলে, 'আল্লাহ্র কুদরত'।

www.BDeBooks.Com

আমি ছোট চাচাকে বললাম, রহিমাকে একটু খবর দিয়ে আনানো যায় না ? ছোট চাচা বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন ?

'কথা বলতাম।'

'খবর দেওয়ার দরকার নাই। এমনেই আসব।'

'এমনিতেই আসবে কেন ?'

ছোট চাচা বললেন— তুমি পুলাপান নিয়া আসছ। চাইরদিকে খবর গেছে। এই গেরামের যত মেয়ের বিয়া হইছে সব অখন নাইওর আসব। এইটাই নিয়ম।

আমি অবাকই হলাম। সত্যি সত্যি এটাই নাকি নিয়ম। গ্রামের কোনো বিশিষ্ট মানুষ আসা উপলক্ষে গ্রামের সব মেয়ে নাইওর আসবে। বাপের দেশে আসার এটা তাদের একটা সুযোগ। এই সুযোগ তারা নষ্ট করবে না।

আমি আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেউ কী এসেছে ?

'আসব না মানে ? গেরামের একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে না ?'

আমি ছোট চাচাকে বললাম, আমাদের আসা উপলক্ষে যেসব মেয়ে নাইওর আসবে তাদের প্রত্যেককে যেন একটা করে দামি শাড়ি উপহার হিসেবে দেয়া হয়, একদিন খুব যত্ন করে দাওয়াত খাওয়ানো হয়।

ছোট চাচা এটা পছন্দ করলেন না। তবে তাঁর রাজি না হয়েও কোনো উপায় ছিল না। আমাদের জমিজমা তিনি দীর্ঘদিন ধরে ভোগদখল করছেন।

গ্রামের নিয়মমতো একসময় রহিমাও এল। সঙ্গে চারটি ছোট ছেলেমেয়ে। হতদরিদ্র অবস্থা। স্বামীর বাড়ি থেকে সে আমার জন্যে দুটা ডালিম নিয়ে এসেছে।

আমার স্ত্রী তাকে খুব যত্ন করে খাওয়াল। খাওয়ার শেষে তাকে শাড়িটি দেয়া হলো। মেয়েটি অভিভূত হয়ে গেল। এরকম একটা উপহার বোধহয় তার কল্পনাতেও ছিল না। তার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। আমি তাকে আমার ঘরে ডেকে নিলাম। কোমল গলায় বললাম, কেমন আছ রহিমা ?

রহিমা ফিসফিস করে বলল, ভালো আছি ভাইজান।

'শাড়ি পছন্দ হয়েছে ?'

'পছন্দ হইব না! কী কন ভাইজান! অত দামি জিনিস কি আমরা কোনোদিন চউক্ষে দেখছি!'

'তোমার ভাইয়ের ব্যাপারটা জানতে চাচ্ছিলাম। তুমি কী করে বুঝলে ভাই বেঁচে আছে ?'

রহিমা অনেকটা চুপ করে থেকে বলল, কী কইরা বুঝলাম আমি নিজেও জানি না ভাইজান। মৃত্যুর খবর শুইন্যা দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসছি। বাড়ির উঠানে পাও দিতেই মনে হইল মস্তাজ বাঁইচ্যা আছে।

'কীজন্যে মনে হলো ?'

'জানি না ভাইজান। মনে হইল।'

'এইরকম কি তোমার আগেও হয়েছে ? মানে কোনো ঘটনা আগে থেকেই কি তুমি বলতে পার ?'

'জী না।'

'মস্তাজ তোমাকে কিছু বলেনি ? জ্ঞান ফিরলে সে কী দেখল বা তার কী মনে হল ?'

'জী না।'

'জিজ্ঞেস করোনি ?'

'করছি। হারামজাদা কথা কয় না।'

রহিমা আরো খানিকক্ষণ বসে পানটান খেয়ে চলে গেল।

আমার টানা লেখালেখিতে ছেদ পড়ল। কিছুতেই আর লিখতে পারি না। সবসময় মনে হয় বাচ্চা একটি ছেলে কবরের বিকট অন্ধকারে জেগে উঠে কী ভাবল ? কী সে দেখল ? তখন তার মনের অনুভূতি কেমন ছিল ?

মস্তাজ মিয়াকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে, আমার মনে হয় জিজ্ঞেস করাটা ঠিক হবে না। সবসময় মনে হয় বাচ্চা একটি ছেলেকে ভয়ের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়াটা অন্যায় কাজ। এই ছেলে নিশ্চয়ই প্রাণপণে এটা ভুলতে চেষ্টা করছে। ভুলতে চেষ্টা করছে বলেই কাউকে কিছু বলতে চায় না। তবু একদিন কৌতূহলের হাতে পরাজিত হলাম।

দুপুরবেলা।

গল্পের বই নিয়ে বসেছি। পাড়াগাঁর ঝিম-ধরা দুপুর। একটু যেন ঘুম-ঘুম আসছে। জানালার বাইরে খুট করে শব্দ হলো। তাকিয়ে দেখি মস্তাজ। আমি বললাম— কী খবর রে মস্তাজ ?

'ভালো।'

'বোন আছে না চলে গেছে ?'

'গেছেগা।'

'আয় ভেতরে আয়।'

মস্তাজ ভেতরে চলে এল। আমার সঙ্গে তার ব্যবহার এখন বেশ স্বাভাবিক। প্রায়ই খানিকটা গল্পগুজব হয়। মনে হয় আমাকে সে খানিকটা

www.BDeBooks.Com

পছন্দও করে। এইসব ছেলে ভালোবাসার খুব কাঙাল হয়। অল্পকিছু মিষ্টি কথা, সামান্য একটু আদর— এতেই তারা অভিভূত হয়ে যায়। এই ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটেছে বলে আমার ধারণা।

মস্তাজ এসে খাটের এক প্রান্তে বসল। আড়ে আড়ে আমাকে দেখতে লাগল। আমি বললাম, তোর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলি, কেমন ?

'আইচ্ছা।'

'ঠিকমতো জবাব দিবি তো ?'

'হুঁ।'

'আচ্ছা মস্তাজ, কবরে তুই জেগে উঠেছিলি, মনে আছে ?'

'আছে।'

'যখন জেগে উঠলি তখন ভয় পেয়েছিলি ?'

'না।'

'না কেন ?'

মস্তাজ চুপ করে রইল। আমার দিক থেকে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। আমি বললাম, কী দেখলি— চারদিক অন্ধকার ?

'হ।'

'কেমন অন্ধকার ?'

মস্তাজ এবারও জবাব দিল না। মনে হচ্ছে সে বিরক্ত হচ্ছে।

আমি বললাম, কবর তো খুব অন্ধকার তবু ভয় লাগল না ?

মস্তাজ নিচুস্বরে বলল, আরেকজন আমার সাথে আছিল সেইজন্যে ভয় লাগে নাই।

আমি চমকে উঠে বললাম, আরেকজন ছিল মানে ? আরেকজন কে ছিল ?

'চিনি না। আন্ধাইরে কিচ্ছু দেখা যায় না।'

'ছেলে না মেয়ে ?'

'জানি না।'

'সে কী করল ?

'আমারে আদর করল। আর কইল, কোনো ভয় নাই।'

'কীভাবে আদর করল ?'

'মনে নাই।'

'কী কী কথা সে বলল ?'

'মজার মজার কথা— খালি হাসি আসে।'

বলতে বলতে মস্তাজ মিয়া ফিক করে হেসে ফেলল।

আমি বললাম, কীরকম মজার কথা ? দুএকটা বল তো শুনি ?

'মনে নাই।'

'কিছুই মনে নাই ? সে কে এটা কি বলেছে ?'

'জী না।'

'ভালো করে ভেবেটেবে বল তো— কোনোকিছু কি মনে পড়ে ?'

'উনার গায়ে শ্যাওলার মতো গন্ধ ছিল।'

'আর কিছু ?'

মস্তাজ মিয়া চুপ করে রইল।

আমি বললাম, ভালো করে ভেবেটেবে বল তো! কিছুই মনে নেই ?

মস্তাজ মিয়া অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, একটা কথা মনে আসছে।

'সেটা কী ?'

'বলতাম না। কথাডা গোপন।'

'বলবি না কেন ?'

মস্তাজ জবাব দিল না।

আমি আবার বললাম, বল মস্তাজ, আমার খুব শুনতে ইচ্ছা করছে।

মস্তাজ উঠে চলে গেল।

এই তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। বাকি যে-ক'দিন গ্রামে ছিলাম সে কোনোদিন আমার কাছে আসেনি। লোক পাঠিয়ে খবর দিয়েছি তবু আসেনি। কয়েকবার নিজেই গেলাম। দূর থেকে দেখতে পেয়ে সে পালিয়ে গেল। আমি আর চেষ্টা করলাম না।

কিছু রহস্য সে তার নিজের কাছে রাখতে চায়। রাখুক। এটা তার অধিকার। এই অধিকার অনেক কষ্টে সে অর্জন করেছে। শ্যাওলাগন্ধী সেই ছায়াসঙ্গীর কথা আমরা যদি কিছু নাও জানি তাতেও কিছু যাবে আসবে না।

www.BDeBooks.Com

শবযাত্রা

পুরোপুরি নাস্তিক মানুষের সংখ্যা এই পৃথিবীতে খুবই কম। ঘোর নাস্তিক যে-মানুষ তাকেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে খুব দুর্বল দেখা যায়। আমি একজন ঘোর নাস্তিককে চিনতাম, তার ঠোঁটে একবার একটা গ্রোথের মতো হলো। ডাক্তাররা সন্দেহ করলেন ক্যানসার। সঙ্গে সঙ্গে সেই নাস্তিক পুরোপুরি আস্তিক হয়ে গেলেন। তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার জন্যে মসজিদে যান। মালিবাগের পীর সাহেবের মুরিদও হলেন।

বায়োপসির পর ধরা পড়ল যে গ্রোথের ধরন খারাপ নয়। লোকালাইজড গ্রোথ। ভয়ের কিছু নেই। অপারেশন করে ফেলে দিলেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক আবার নাস্তিক হয়ে পড়লেন। ভয়াবহ ধরনের নাস্তিক। অঙ্ক করে প্রমাণ করে দিলেন যে ঈশ্বর = O^2 এবং আত্মা = $O^{1/2}$।

যাই হোক, মানুষের চরিত্রের এই দ্বৈত ভাব আমাকে বিস্মিত করে না। প্রচণ্ডরকম ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষের মধ্যেও আমি অবিশ্বাসের বীজ দেখেছি। আমার কাছে এটাই স্বাভাবিক মনে হয়। এর বাইরে কিছু দেখা মানে অস্বাভাবিক কিছু দেখা।

আমি এরকম একজন অস্বাভাবিক চরিত্রের কথা এই গল্পে বলব। চরিত্রের নাম মোতালেব (কাল্পনিক নাম)। বয়স পঞ্চাশ থেকে পাঁচপঞ্চাশ। ভীষণ রোগা এবং প্রায় তালগাছের মতো লম্বা একজন মানুষ। চেইন স্মোকার। মাথায় কিছু অসুবিধা আছে বলেও মনে হয়। নিতান্ত অপরিচিত লোককেও এই ভদ্রলোক শীতল গলায় বলে ফেলতে পারেন— ভাই কিছু মনে করবেন না। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি একজন মহামূর্খ।

মোতালেব সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় এক বিয়েবাড়িতে। সেদিন ঐ বিয়েবাড়িতে কী-একটা সমস্যা হয়েছে— কাজি পাওয়া যাচ্ছে না কিংবা এইজাতীয় কিছু।

বরপক্ষীয় এবং কনেপক্ষীয় লোকজন বিমর্ষ মুখে ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে গল্প করছে। আমি একটা দলের সঙ্গে জুটে গেলাম। সেখানে জনৈক অধ্যাপক বিগ ব্যাং এবং এক্সপানডিং ইউনিভার্স সম্পর্কে কথা বলছেন। শ্রোতারা চোখ বড় বড় করে শুনছে। ভদ্রলোক ব্ল্যাক হোল সম্পর্কে কথা বলা শুরু করেছেন, তখন একটা নাটকীয় ব্যাপার ঘটল। রোগা এবং লম্বা একজন শুকনো মানুষ বললেন, ভাই কিছু মনে করবেন না, আপনি একজন মহামূর্খ।

অধ্যাপক ভদ্রলোক নিজেকে সামলাতে কিছু সময় নিলেন। পুরোপুরি সামলাতে পারলেন না— কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, আপনি কী আমাকে মহামূর্খ বললেন ?

'জী।'

'কেন বললেন জানতে পারি ?'

'অবশ্যই জানতে পারেন। আপনি আপনার বক্তৃতা শুরুই করেছেন ভুল তথ্য দিয়ে— বলছেন ব্যাকগ্রাউণ্ড রেডিয়েশন ধরা পড়েছে ইনফ্রারেডে। তা পড়েনি। ধরা পড়েছে মাইক্রোওয়েভে। আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটির একটি স্বীকার্যই হচ্ছে স্পেস এবং টাইমের জন্ম বিগ ব্যাং সিংগুলারিটিতে। আপনি বললেন ভিন্ন কথা। কোনোকিছুই না জেনে একটার সঙ্গে একটা মিলিয়ে কী সব উলটাপালটা কথা বলছেন।'

অধ্যাপক ভদ্রলোক রাগে তোতলাতে তোতলাতে বললেন, 'আমি তো ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস নিচ্ছি না— একটু এদিক-ওদিক হতেই পারে।'

'বিজ্ঞান ঠাকুরমার ঝুলি না যে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে বলবেন।'

ভদ্রলোক সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে অন্যদিকে সরে গেলেন। আমি গেলাম তাঁর পেছনে পেছনে। মজার চরিত্র। কথা বলা দরকার।

যতটুকু মজার চরিত্র ভেবে ভদ্রলোকের কাছে গেলাম দেখা গেল চরিত্র তারচেয়েও মজার। ভদ্রলোকের বিষয় পদার্থবিদ্যা নয়— সাইকোলজি। পদার্থবিদ্যা হচ্ছে তাঁর শখ। এই শখ মেটানোর জন্যে রীতিমতো শিক্ষক রেখে অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা শিখেছেন।

এইজাতীয় লোকদের সঙ্গে সহজে বন্ধুত্ব হয় না। আমি লক্ষ করেছি এরা সচরাচর সন্দেহবাতিকগ্রস্ত হয়ে থাকে। এই লোকও দেখা গেল সেইরকম। একদিন বেশ বিরক্ত হয়েই বললেন, আপনি দেখি মাঝে-মাঝেই আমার কাছে আসেন। বিষয়টা কী বলেন তো ?

www.BDeBooks.Com

'বিষয় কিছু না।'

'বিষয় কিছু না বললে তো হবে না। এ পৃথিবীতে কার্যকারণ ছাড়া কিছুই হয় না।'

আমি হাসিমুখে বললাম, ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স, তাই বলে কিন্তু ভাই মোতালেব সাহেব, হাইজেনবার্গের আনসারটিনিটি প্রিন্সিপ্যাল আপনি ভুলে যাচ্ছেন। একটি বস্তুকে পুরোপুরি আপনি কিন্তু জানেন না। যখন অবস্থান জানেন তখন সঠিক গতি কী তা জানেন না...।

'আপনার সঙ্গে কূটতর্কে যেতে চাচ্ছি না— আপনি স্পষ্ট করে বলুন কীজন্যে আমার কাছে আসেন— মদ্যপানের লোভে ?'

আমি ঝামেলা এড়াবার জন্যে বললাম, হ্যাঁ।

'ভালো কথা। আমার পেছনে অনেকেই ঘোরে এবং তাদের উদ্দেশ্য একটাই— বিনা পয়সায় মদ্যপান। তৃষ্ণার্ত মধ্যবিত্ত বাঙালি মদ্যপান করতে চায় তবে তা নিজের বাসায় নয় অন্যের বাসায়— যাতে স্ত্রী জানতে না পারে। নিজের পয়সায় না, অন্যের পয়সায়, যাতে টাকা-পয়সা খরচ না হয়— অদ্ভুত মধ্যবিত্ত।'

আমি বললাম, আপনি মনে হচ্ছে মধ্যবিত্তদের ওপর খুব বিরক্ত।

'অফকোর্স বিরক্ত। মধ্যবিত্ত হচ্ছে সমাজের একটা ফাজিল অংশ। আনকন ট্রোলড গ্রোথ। এই মধ্যবিত্তের প্রথম প্রেমের অভিজ্ঞতা হয় কাজিনের সঙ্গে, প্রথম যৌনতার অভিজ্ঞতা হয় বাড়ির কাজের মেয়ের সঙ্গে। প্রথম মদ্যপানের অভিজ্ঞতা হয় অন্যের পয়সায়। এখন বলুন আপনাকে কী দেব ? স্কচ ক্লাব আছে, জিন আছে, ভদকা আছে, কয়েক পদের হুইসকি আছে। আর আপনার যদি মিক্সড ড্রিংক পছন্দ হয় তা হলে তাও বানিয়ে দেব। You name it, I will make it— হা হা হা।'

'কিছু মনে করবেন না ভাই। আপনাকে মিথ্যা কথা বলেছিলাম— বিনা পয়সায় মদের লোভে না, আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার লোভেই আমি আসি।'

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, আমাকে কি ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার বলে মনে হয় ?

'হ্যাঁ।'

'আমি এই নিয়ে তিনবার বিয়ে করেছি— কোনো স্ত্রী আমাকে ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার বলে মনে করেনি। প্রথমজন অনেক কষ্টে দু'বছরের মতো টিকে ছিল, বাকি দুজন এক বছরও টেকেনি। হা হা হা।'

'না টেকায় আপনি মনে হচ্ছে খুশিই হয়েছেন।'

'হ্যাঁ হয়েছি। স্ত্রীরা স্বামীদের স্বাধীনতায় হাত দিতে পছন্দ করে। শুধু শুধু নানা বায়নাক্কা— মদ খেতে পারবে না, রাত জেগে পড়তে পারবে না, জুয়া খেলতে পারবে না— আরে কী মুশকিল, আমার সব কথায় কথা বল কেন ? আমি কি তোমার কোনো ব্যাপারে মাথা গলাই ? আমি কি বলি— নীল শাড়ি পরতে পারবে না, লাল শাড়ি পরতে হবে। হাইহিল পরতে পারবে না, ফ্ল্যাট স্যাণ্ডেল পরবে। বলি কখনো ? না, বলি না। আমি ওদেরকে ওদের মতো থাকতে বলি। আমি নিজে থাকতে চাই আমার মতো। ওরা তা দেবে না।'

'এই যে এখন একা একা বাস করছেন, আপনি কি মনে করেন আপনি সুখী ?'

'হ্যাঁ সুখী, মাঝে মাঝে একটু দুঃখ-দুঃখ ভাব চলে আসে, তখন মদ্যপান করি। প্রচুর পরিমাণেই করি। পুরোপুরি মাতাল হতে চেষ্টা করি। পারি না। শরীর যখন আর অ্যালকোহল অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না তখন বমি করে ফেলে দেয় কিন্তু মাতাল হতে দেয় না। কেন দেয় না তারও একটা কারণ আছে।'

'কী কারণ ?'

'বলব, আরেকদিন বলব। এখন বলেন কী খাবেন ? আজকের আবহাওয়াটা 'ব্লাডি মেরির' জন্যে খুব আইডিয়াল। দেব একটা ব্লাডি মেরি বানিয়ে ? জিনিসটা স্বাস্থ্যের জন্যেও ভালো। প্রচুর টমেটোর রস দেয়া হয়।'

ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার ভালোই খাতির হলো। মাসে দুএকবার তাঁর কাছে যাই। বিচিত্র সব বিষয় নিয়ে কথা হয়। যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব, অ্যান্টিম্যাটার, লাইফ আফটার ডেথ। ভদ্রলোকের নাস্তিকতা দেখার মতো, যা বলবেন— বলবেন। কোথাও সংশয়ের কিছু রাখবেন না। আমার মতো আরো অনেকেই আসে। তবে তাদের মূল আগ্রহ জলযাত্রায়।

একবার আমাদের আড্ডায় এক ভদ্রলোক একটি ব্যক্তিগত ভৌতিক অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল এরকম— শ্রাবণ মাসে একবার তিনি গ্রামের বাড়ি যাচ্ছেন। বাড়ি স্টেশন থেকে অনেকখানি দূর। সন্ধ্যাবেলা ট্রেন এসে পৌঁছার কথা। পৌঁছতে পৌঁছতে রাত ন'টা বেজে গেল। গ্রামদেশে রাত ন'টা মানে নিশুতি রাত। ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। স্টেশনে একটাও লোক নেই। একা একাই রওনা হলাম। কিছুদূর যাবার পর হঠাৎ দেখি আমার আগে-আগে কে যেন সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ কাউকে দেখিনি। এখন এই সাইকেলে করে কে যাচ্ছে ? আমি বললাম— কে কে কে ? কেউ জবাব দিল

www.BDeBooks.Com

না। লোকটা একবার শুধু মুখ ফিরিয়ে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে চিনলাম। যে সাইকেলে বসে আছে তার নাম পরমেশ। আমরা একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি। বছর তিনেক আগে নিউমোনিয়া হয়ে মারা যায়...

গল্পের এই পর্যায়ে মোতালেব সাহেব বাজখাঁই গলায় বললেন— স্টপ। আপনি বলতে চাচ্ছেন— আপনার এক মৃত বন্ধু সাইকেল চালিয়ে আপনার পাশে পাশে যাচ্ছিল ?

'হ্যাঁ।'

'মনে হচ্ছে আপনাকে সাহস দেবার জন্যেই সে আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল।'

'হতে পারে।'

মোতালেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, তর্কের খাতিরে স্বীকার করে নিলাম যে, আপনার বন্ধু মরে ভূত হয়েছেন। আপনাকে সাহস দেবার জন্যে আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছেন। এখন সমস্যা হলো— সাইকেল। একটা সাইকেল মরে 'সাইকেল-ভূত' হবে না, যদি না হয় তা হলে আপনার ভূত-বন্ধু সাইকেল পেল কোথায় ?

যিনি গল্প করছিলেন তিনি থমকে গেলেন। মোতালেব সাহেব বললেন, স্বীকার করলাম অবশ্যই তর্কের খাতিরে যে মানুষ মরে ভূত হতে পারে, তাই বলে কাপড় মরে তো 'কাপড়-ভূত' হবে না। আমরা যদি ভূত দেখি তাদের ল্যাংটা দেখা উচিত। ওরা কাপড় পায় কোথায় ? সবসময় দেখা যায় ভূত একটা সাদা কাপড় পরে থাকে। এর মানে কী ?'

মজার ব্যাপার হচ্ছে— এই ঘোর নাস্তিক, প্রচণ্ড যুক্তিবাদী মানুষের কাছ থেকে আমি অবিশ্বাস্য একটি গল্প শুনি। যেভাবে গল্পটি শুনেছিলাম অবিকল সেইভাবে বলছি। গল্পের শেষে মোতালেব সাহেব কিছু ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। অপ্রয়োজনীয় বিধায় সেই ব্যাখ্যা আমি দিচ্ছি না। বৈশাখ মাসের এক ঝড়বৃষ্টির সন্ধ্যায় মোতালেব সাহেব গল্প শুরু করলেন।

'এই যে ভাই লেখক, ইন্টারেস্টিং অভিজ্ঞতার একটা ঘটনা শুনবেন ? একটা কন্ডিশনে ঘটনাটা বলতে পারি। চুপ করে শুনে যাবেন। কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না। এবং ঘটনাটা বিশ্বাস করতে পারবেন না।'

'বিশ্বাস করলে অসুবিধা কী ?'

'অসুবিধা আছে। আমার মাধ্যমে কোনো অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার প্রচার পাবে তা হয় না। তা হতে দেয়া যায় না। আপনি যদি ধরে নেন এখন যা শুনছেন তা একটা গল্প, মজার গল্প, তা হলেই আপনাকে বলতে পারি।'

'এই গল্পটি কোথাও ব্যবহার করতে পারি ?'

'পারেন। কারণ গল্প-উপন্যাসকে কেউ গুরুত্ব দেয় না। সবাই ধরে নেয় এগুলি বানানো ব্যাপার।'

'তা হলে বলুন শুনি।'

ভদ্রলোক পরপর চার পেগ মদ্যপান করলেন। তাঁর মদ্যপানের ভঙ্গিও অদ্ভুত। অষুধের মেজারিং গ্লাস ভরতি করে হুইসকি নেন। এক ফোঁটাও পানি মেশান না। ঢক করে পুরোটা মুখে ফেলে দেন কিন্তু গিলে ফেলেন না। কুলকুচা করার মতো শব্দ হয়। তারপর একসময় ঘোঁত করে গিলে ফেলে বলেন— কেন যে মানুষ এইসব ছাইপাশ খায়! বলেই আবার খানিকটা নেন। যা-ই হোক, ভদ্রলোকের জবানিতে মূল গল্পে যাচ্ছি—

'তখন আমার বয়স চব্বিশ, এম.এ. পাস করেছি। ধারণা ছিল খুব ভালো রেজাল্ট হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে টিচার হিসেবে এন্ট্রি পেয়ে যাব। তা হয়নি। এম.এ.-র রেজাল্ট খুবই খারাপ হলো। কেন হলো তা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। পরীক্ষা ভালো দিয়েছি। একটা গুজব শুনতে পাচ্ছি— জনৈক অধ্যাপক রাগ করে আমাকে খুবই কম নম্বর দিয়েছেন। এই গুজব অমূলক নাও হতে পারে। অধ্যাপকদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো না। দুএকজন আমাকে বেশ পছন্দ করেন, আবার কেউ-কেউ আছেন আমার ছায়াও সহ্য করতে পারেন না।

যা বলছিলাম, রেজাল্টের পর মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাবা খুব রাগারাগি করলেন। হিন্দি ভাষায় বললেন— নিকালো। আভি নিকালো।

আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম, চলে যাচ্ছি। হিন্দি বলার দরকার নেই।

এই বলেই সুটকেস গুছিয়ে বের হয়ে পড়লাম। আমি খুবই সচ্ছল পরিবারের ছেলে। কাজেই খালিহাতে ঘর থেকে বের হলাম না। বেশকিছু টাকা সঙ্গে নিয়ে বের হলাম। কোথায় যাচ্ছি কাউকে বলে গেলাম না। সঙ্গে একগাদা বই, বিশাল একটা খাতা। এক ডজন বলপয়েন্ট। সেই সময় আমার লেখালেখির বাতিক ছিল। একটা ডিটেকটিভ উপন্যাস শুরু করেছিলাম, যে-উপন্যাসে মূল ডিটেকটিভ খুন করে। ইন্টারেস্টিং গল্প।

যা-ই হোক, বাড়ি থেকে বের হয়েও খুব একটা দূরে গেলাম না। একটা হোটেলে ঘর ভাড়া করে রইলাম। দেখি সেখানে কাজ করার খুব অসুবিধা— সারাক্ষণ হইচই। কিছু-কিছু কামরায় রাতদুপুরে মদ খেয়ে মাতলামিও করে। মেয়েছেলে নিয়ে আসে।

www.BDeBooks.Com

হোটেল ছেড়ে দিয়ে শহরতলিতে একটা বেশ বড় বাড়ি ভাড়া করে বসলাম। এক জজসাহেব শখ করে বাড়ি বানিয়েছিলেন। তার শখ হয়তো এখনও আছে, ছেলেমেয়েদের শখ মিটে গেছে। এ-বাড়িতে কেউ আর থাকতে আসে না।

একজন কেয়ারটেকার-কাম মালী-কাম দারোয়ান আছে। বাড়ির পুরো দায়িত্ব তার। লোকটিকে দেখেই মনে হয় বদলোক। আমাকে যে বাড়িভাড়া দিয়েছে মনে হচ্ছে নিজ দায়িত্বেই দিয়েছে। ভাড়ার টাকা মালিকের কাছে পৌঁছাবে বলে মনে হলো না। ওটা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। পৌঁছলে পৌঁছবে, না পৌঁছলে নেই। আমার এক মাস থাকার কথা সেটা থাকতে পারলেই হলো। নিরিবিলি বাড়ি, আমার খুবই পছন্দ হলো। লেখালেখির জন্যে চমৎকার।

কেয়ারটেকারের নাম ইয়াকুব। বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছে। রিপালসিভ ধরনের চেহারা, তবে গলার স্বরটা অতি মধুর। আমি একাই এ-বাড়িতে থাকব শুনে সে বিস্মিত গলায় বলল, স্যার কি সত্যি সত্যি একা থাকবেন ?

'হ্যাঁ।'

'বিষয়টা কী ?'

'বিষয় কিছু না। পড়াশোনা করব। লেখালেখি করব।'

'আর খাওয়াদাওয়া ? হোটেল এইখানে পাবেন কোথায় ? সেই যদি শহরে যান। পাঁচ মাইলের ধাক্কা।'

'রান্না করে দেবে এমন কাউকে পাওয়া যায় না ? টাকা-পয়সা দেব।'

'আপনি বললে আমি রাঁধব। খেতে পারবেন কি না সেটা হলো কথা।'

'পারব। খাওয়া নিয়ে আমার কোনো খুঁতখুঁতানি নেই।'

'আরেকটা জিনিস বলে রাখি স্যার। মুরগি ছাড়া কিন্তু কিছু পাওয়া যায় না। হাটবারে মাছটাছ পাওয়া যায়। হাটবারের দেরি আছে। আর চালটা স্যার একটু মোটা আছে। আপনার নিশ্চয়ই চিকন চাল খেয়ে অভ্যাস।'

'চিকন চাল খেয়ে অভ্যাস ঠিকই, মোটা চালে অসুবিধা হবে না। তবে ভাত যেন শক্ত না হয়। শক্ত ভাত খেতে পারি না।'

দেখা গেল লোকটি রান্নায় দ্রৌপদী না হলেও তার কাছাকাছি। দুপুরে খুব ভালো খাওয়াল। রাতেও নতুন নতুন পদ করল। আমি বিস্মিত। রাতে খেতে খেতে বললাম, এত ভালো রান্না শিখলে কোথায় ?

ইয়াকুব গম্ভীর মুখে বলল, আমার স্ত্রীর কাছে শিখেছি। খুব ভালো রাঁধতে পারত।

'পারত বলছ কেন ? এখন কি পারে না ?'

ইয়াকুব গম্ভীর হয়ে গেল। ভাবলাম নিশ্চয়ই খুব ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপার। এখন আর প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে না। তবে সহজেই নিজেকে সামলে নিল। সহজ স্বরে বলল, এখন পারে কি পারে না জানি না স্যার। আমার সঙ্গে থাকে না।

'কোথায় থাকে ?'

'জানি না কোথায় থাকে। ওর চরিত্র খারাপ ছিল। এর তার সাথে যোগাযোগ ছিল। বিশ্রী অবস্থা। বলার মতো না। অনেক দেনদরবার করেছি, কিছু লাভ হয় নাই। তারপর সাত বছরের দুই মেয়ে ঘরে রেখে পালিয়ে গেছে, বুঝে দেখেন কত বড় হারামি।

'কতদিন আগের কথা ?'

'বছর দুই।'

'কোনো খবর পাওয়া যায়নি ?'

'মোড়লগঞ্জ বাজারে নাকি দেখা গিয়েছিল— আমার কোনো আগ্রহ ছিল না। খোঁজ নেই নাই।'

এদের জীবনের এইজাতীয় কিচ্ছাকাহিনী শুনতে সাধারণত ভালোই লাগে। আমার লাগল না। আমাদের সবার জীবনেই একান্ত সমস্যা আছে। সেইসব নিয়ে মাথা ঘামালে চলে না। কিন্তু ইয়াকুব মনে হলো কথা বলবেই।

'জীবনে বড় ভুল কী করেছিলাম জানেন স্যার ? সুন্দরী বিয়ে করেছিলাম। ডানাকাটা পরী বিয়ে করেছিলাম।'

'বউ খুব সুন্দরী ছিল ?'

'আগুনের মতো ছিল। আগুন থাকলেই পোকামাকড় আসে। তা-ই হয়। আমার জীবন হলো অতিষ্ঠ। একদিন মোড়লগঞ্জের বাজারে গেছি, ফিরে এসে দেখি সদরদরজা বন্ধ। অনেকক্ষণ ধাক্কাধাক্কি করলাম, কেউ দরজা খোলে না। শেষে ধুপ করে জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে কে যেন দৌড় দিল। আমি বউরে বললাম— এ কে ? বউ বলল, আমি কী জানি কে ?

ইয়াকুব একের পর এক বউয়ের কীর্তিকাহিনী বলতে লাগল, আমি একসময় বিরক্ত হয়ে বললাম—

'ঠিক আছে বাদ দাও এসব কথা।'

'বাদ দিতে চাইলেও বাদ দেয়া যায় না। তিনবার সালিশি বসল। সালিশিতে ঠিক হলো বউরে তালাক দিতে হবে। তালাক দিলাম না। মন মানল না। তার ওপর যমজ মেয়ে আছে। এর ফল হইল এই...'

www.BDeBooks.Com

'স্ত্রী কোথায় আছে তুমি জান না ?'

'জী না।'

'কী নাম মেয়েদের ?'

'যমজ মেয়ে হয়েছিল জনাব। তুহিন একজনের নাম, তুষার আরেকজনের নাম। নাম রেখেছিল মেয়ের মা।'

'ভালো, খুব ভালো।'

'কোনোকিছু দরকার লাগলে এদের বলবেন। মেয়েরা এইখানেই থাকে, ডাক দিলেই আসবে।'

'না, আমার কিছু লাগবে না।'

'বিরক্ত করলেও বলবেন। থাবড়া দিয়ে গাল ফাটায়ে দিব। মেয়েগুলি বেশি সুবিধার হয় নাই। মায়ের খাসলত পেয়েছে। সারাদিন সাজগোজ। এই পায়ে আলতা, এই ঠোঁটে লিপস্টিক।'

'স্কুলে পড়ে না ?'

'আরে দূর— পড়াশোনা! এরা যায় আর আসে।'

মেয়ে দুটিকে আমার অবিশ্যি খুবই পছন্দ হলো। দুজনই হাস্যমুখ। সারাক্ষণ হাসছে। সবসময় সেজেগুজে আছে। কাজেরও খুব উৎসাহ। যদি বলি, এই এক গ্লাস পানি দাও তো। অমনি ছুটে যাবে। দুজনই দুহাতে দুটা পানিভরতি গ্লাস নিয়ে এসে বলবে, চাচা আমারটা নেন। চাচা আমারটা নেন। আধ গ্লাস পানি খেলেই যেখানে চলত সেখানে বাধ্য হয়ে দু'গ্লাস খাই যাতে মেয়ে দুটোর কোনোটাই কষ্ট না পায়।

স্নেহ নিম্নগামী। যত দিন যেতে লাগল বাচ্চা দুটিকে আমার ততই পছন্দ হতে লাগল। ছোটখাটো কিছু উপহার কিনে দিলাম। দুজনের জন্যে দুটা রং পেন্সিলের সেট, ছোট ছোট আয়না। যা-ই পায় আনন্দে লাফায়। বড় ভালো লাগে দেখতে। ঐ বাড়িতে দেখতে দেখতে এগারো দিন কেটে গেল। বারো দিনের দিন একটা ঘটনা ঘটল। ঘটনাটা বলার আগে পারিপার্শ্বিক অবস্থার একটা বর্ণনা দিয়ে নিই।

আমার বাড়িটা পশ্চিমমুখী। বাড়ির সামনে এবং পেছনে আমন ধানের মাঠ। বাড়ির উত্তরে জংলা ধরনের জায়গা। একসময় নিবিড় বাঁশবন ছিল, এখন পাতলা হয়ে গেছে। দক্ষিণে উলকিবাড়ির বিশাল বাগান। সেই বাগানে আম, জাম, লিচু থেকে শুরু করে আতাফলের গাছ পর্যন্ত আছে। একজন বেঁটেখাটো দাড়িওয়ালা মালী সেই বাগান পাহারা দেয়। আমার সঙ্গে দেখা হলেই গভীর বিনয়ের সঙ্গে জানতে চায়— স্যারের শইলডা কি ভালো ? ঘুমের কোনো ডিসটাব হয় না তো ?

আমি প্রতিবারই বিস্মিত হয়ে বলি, ঘুমের ডিসটার্ব হবে কেন ?

'শহরের মানুষ হঠাৎ গেরামে আইস্যা পড়লেন। এইজন্যে জিগাই।'

'আমার ঘুম, খাওয়াদাওয়া কোনোকিছুতেই কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।'

'অসুবিধা হইলে কইবেন। ভয়ডর পাইলে ডাক দিবেন। আমার নাম বদরুল। আমি রাইতে ঘুমাই না। জাগান থাকি।'

'ঠিক আছে বদরুল। যদি কখনো প্রয়োজন বোধ করি তোমাকে ডাকব।'

বারো দিনের দিন প্রয়োজন বোধ করলাম। দিনটা সোমবার। সকাল থেকেই মেঘলা ছিল। দুপুর থেকে তুমুল বর্ষণ শুরু হলো। এর মধ্যে ইয়াকুব এসে বলল, স্যার একটা বিরাট সমস্যা। তুহিনের গলা ফুলে কী যেন হয়েছে, নিশ্বাস নিতে পারছে না। ওকে তো স্যার ডাক্তারের কাছে নেয়া দরকার।

আমি তৎক্ষণাৎ মেয়েটাকে দেখতে গেলাম। খুবই খারাপ অবস্থা, শুধু গলা না, সমস্ত মুখ ফুলে গেছে। কী কষ্টে যে নিশ্বাস নিচ্ছে সে-ই জানে। মেয়েটার শরীর এত খারাপ অথচ এরা আমাকে কিছুই বলেনি। আমার মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

আমি বললাম, এক মুহূর্ত দেরি করা ঠিক হবে না। তুমি এক্ষুনি মেয়েকে হাসপাতালে নিয়ে যাও।

'স্যার আপনার খাওয়াদাওয়া।'

'আমার খাওয়াদাওয়া নিয়ে তোমাকে কিছু চিন্তা করতে হবে না। চাল ফুটিয়ে নিতে পারব। একটা ডিমও ভেজে নেব। তুমি দেরি করবে না।'

আমি ইয়াকুবকে কিছু টাকা দিলাম। সে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দুই মেয়েকে একটা গরুর গাড়িতে তুলে রওনা হয়ে গেল। আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। কেন যেন মনে হলো মেয়েটা বাঁচবে না।

আমি থাকি দোতলার দক্ষিণমুখী একটা ঘরে। ঘরটা বিশাল। দুদিকে জানালা আছে। আসবাবপত্র বলতে পুরনো একটা খাট, খাটের পাশে লেখার টেবিল। লেখার টেবিলে হারিকেন ছাড়াও মোমদানে মোমবাতি। লেখালেখির জন্যে শুধু হারিকেনের আলো যথেষ্ট নয় বলেই মোমবাতির ব্যবস্থা।

কেন জানি সন্ধ্যার পর থেকে ভয়-ভয় করতে লাগল। বিছানায় বসে লিখছি। হঠাৎ মনে হলো কেউ-একজন দক্ষিণের বারান্দায় নরম পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। আমি 'কে কে' বলতেই হাঁটার শব্দ থেমে গেল।

www.BDeBooks.Com

আমি দুর্বলচিত্তের মানুষ নই। তবে যে-কোনো সাহসী মানুষও কোনো কারণে বিশাল একটা বাড়িতে একা পড়ে গেলে একটু অন্যরকম বোধ করে। আমার কেমন অন্যরকম লাগতে লাগল। সেই অন্যরকমটাও আমি ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারছিলাম না। একবার মনে হচ্ছে পানির পিপাসা হচ্ছে আবার পর-মুহূর্তেই মনে হচ্ছে— না, পানির পিপাসা না— অন্যকিছু। অনেক চেষ্টা করেও কিছু লিখতে পারলাম না। লেখার জন্যে মাথা নিচু করতেই মনে হয় দরজার ফাঁক দিয়ে কেউ আমাকে দেখছে। তাকাতেই সরে যাচ্ছে। দুবার আমি বললাম— কে কে ? বলেই লজ্জা পেলাম। কে কে বলে চ্যাঁচানোর কোনো মানে হয় না।

এই সময় লক্ষ করলাম হারিকেনের আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। তেল কমে এসেছে। এক্ষুনি হয়তো দপ করে নিভে যাবে। এতে ভয় পাবার তেমন কোনো কারণ নেই। আরো একটি হারিকেন পাশের ঘরে আছে। সবুজ রঙের বড় একটা বোতলে কেরোসিন তেল থাকে। সেই বোতলটি একতলায় রান্নাঘরে। তা ছাড়া মোমবাতি তো আছেই।

আমি নিবুনিবু হারিকেন নিয়ে একতলায় নেমে গেলাম। চা বানিয়ে খাব। হারিকেনে তেল ভরব। রাতে খাবার কিছু করা যায় কি না তাও দেখব।

দেখলাম রাতে খাবার জন্যে চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই। ইয়াকুব ভাত রেঁধে রেখে গেছে। কড়াইয়ে ডাল আছে। ডিম আছে। ইচ্ছা করলেই ডিম ভেজে নেয়া যায়।

চা বানিয়ে খেলাম। ফ্লাস্ক ভরতি করে চা নিয়ে দোতলায় উঠে এলাম। বারান্দায় পা দিতেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। মনে হলো সবুজ রঙের ডুরে শাড়ি পরা একটি মেয়ে যেন হঠাৎ দ্রুত সরে গেল। মেয়েটার চোখ দুটি মায়া-মায়া। কিন্তু এই অন্ধকারে মেয়েটার চোখ দেখার কথা না। তা হলে আমি এসব কী দেখছি ?

বৃষ্টির বেগ খুব বাড়ছে। রীতিমতো ঝোড়ো হাওয়া বইছে। আমি আমার ঘরে আগের জায়গায় ফিরে এলাম। জানালা বন্ধ করে দিলাম। শোঁ শোঁ শব্দ তবু কমল না।

ঠিক তখন বজ্রপাত হলো। প্রচণ্ড বজ্রপাত। সাউন্ডওয়েভের নিজস্ব একটা ধাক্কা আছে। এই ধাক্কায় মোমবাতির কিংবা হারিকেনের শিখা নিভে যায়। টেবিলের উপর হারিকেনের আলো নিভে গেল। হঠাৎ চারদিক গাঢ় অন্ধকার।

আমি তখন পরিষ্কার শুনলাম মেয়েলি গলায় কেউ-একজন বলছে— আপনে বাইরে আসেন। আমি চেঁচিয়ে বললাম, কে ? সেই আগের কণ্ঠ আবার শোনা গেল— ভয় পাইয়েন না। একটু বাইরে আইসা দাঁড়ান।

অল্পবয়স্ক মেয়েমানুষের গলা। পরিষ্কার গলা।

আমি আবার বললাম, কে, তুমি কে ?

কোনো জবাব পাওয়া গেল না। মনে হলো কেউ যেন ছোট্ট করে নিশ্বাস ফেলল। ঘরের দরজা একটু ফাঁক করল।

আমি উঠে বারান্দায় চলে এলাম। বারান্দায় কেউ নেই। তবু মনে হলো কেউ-একজন বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। সে চাচ্ছে কিছুটা সময় আমি বারান্দায় থাকি।

ধুপ ধুপ শব্দ আসছে। শব্দ কোত্থেকে আসছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে কোদাল দিয়ে কেউ মাটি কোপাচ্ছে। এই ঝড়বৃষ্টির রাতে কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে কে ? আমি বারান্দায় রেলিঙের দিকে এগিয়ে গেলাম, তখন বিদ্যুৎ চমকাল। বিদ্যুতের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম দক্ষিণ দিকের বাঁশবনের কাছে কোদাল দিয়ে একজন মাটি কোপাচ্ছে। যে মাটি কোপাচ্ছে সে হলো আমাদের ইয়াকুব।

কিন্তু ইয়াকুব এখানে আসবে কেন ? ও তো মেয়ে নিয়ে শহরে গেছে। বিদ্যুৎচমক দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না। এক একবার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর আমি তাকে দেখছি। সে খুব ব্যস্ত হয়ে মাটি কোপাচ্ছে। গভীর গর্ত করছে। সে কি কবর খুঁদছে। পাশে কাপড় দিয়ে মোড়া লম্বা এটা কী ?

পরিষ্কার কিছু দেখছি না। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে তখনই শুধু দেখছি। বুঝতে পারছি এটা বাস্তব কোনো দৃশ্য নয়। এই দৃশ্যের জন্ম আমার চেনাজানা জগতে নয়। অন্য জগতে অন্য সময়ে।

আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছি। মুষলধারে বর্ষণ হচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আমি ইয়াকুবকে দেখছি। সে অতি ব্যস্ত। অতি দ্রুত কবর খুঁদছে। কার কবর ? সবুজ কাপড়ে মোড়া একটি মৃতদেহ পাশেই রাখা। বৃষ্টির পানিতে তা ভিজছে। এটা কি তার স্ত্রীর মৃতদেহ ? কী আশ্চর্য, হাত পাঁচেক দূরে বাচ্চা দুটি বসে আছে। এরা একদৃষ্টিতে মৃতদেহটির দিকে তাকিয়ে আছে।

যে-রূপবতী স্ত্রীর পালিয়ে যাবার কথা ইয়াকুব বলে, এই কি সেই মেয়ে ? এই মেয়েটিকে সে-ই কি হত্যা করেছিল ? হত্যাকাণ্ডটি কোনো-এক বর্ষার রাতে ঘটেছিল ? কোনো-এক অস্বাভাবিক উপায়ে সেই মুহূর্তটি কি

www.BDeBooks.Com

আবার ফিরে এসেছে ? আমি দেখছি। ইন্দ্রিয়ের অতীত কোনো-একটি দৃশ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে ধরা পড়ছে আমার কাছে।

আমি আমার এই জীবনে কোনো অতিপ্রাকৃত বিষয়কে স্থান দিইনি। আজ আমি এটা কী দেখছি ?'

ভদ্রলোক এইখানে গল্প শেষ করলেন।

আমি বললাম, তারপর ? তারপর কী হলো ?

তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, আপনাকে একটা ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাচ্ছিলাম, বলা হলো। এর আর তারপর বলে কিছু নেই।

'আপনি এই দৃশ্যটি দেখলেন, তারপর কী করলেন ?'

'আপনি হলে কী করতেন ?'

'আমি হলে কী করতাম সেটা বাদ দিন। আপনি কী করেছেন সেটা বলুন।'

'দাঁড়ান, আরো খানিকটা অ্যালকোহল গলায় ঢেলে নিই। তা না হলে বলতে পারব না।'

ভদ্রলোক ঢকঢক করে অনেকখানি কাঁচা-হুইসকি গলায় ঢেলে দিলেন। দেখতে দেখতে তাঁর চোখ রক্তবর্ণ হয়ে গেল। তিনি স্থির গলায় বললেন— আমি সেদিন যা করেছিলাম একজন বুদ্ধিমান যুক্তিবাদী মানুষ তা-ই করবে— আমি ছুটে গিয়েছিলাম সেখানে। প্রচণ্ড ভয়াবহ কোনো ঘটনার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালে মানুষের ভয় থাকে না। একজাতীয় এনজাইম শরীরে চলে আসে। তখন প্রচুর গ্লুকোজ ভাঙতে শুরু করে। মানুষ শারীরিক শক্তি পায়। ভয় কেটে যায়।

'আমার কোনো ভয় ছিল না। আমি দ্রুত গেলাম ঐ জায়গায়। কাদায় পানিতে মাখামাখি হয়ে গেলাম।'

'তারপর কী দেখলেন ?'

'কী আর দেখব ? কিছুই দেখলাম না। আপনি কি ভেবেছেন গিয়ে দেখব ইয়াকুব তার স্ত্রীর ডেডবডি নিয়ে বসে আছে ?'

'না, তা ভাবিনি।'

'নেচার বলুন বা ঈশ্বর বলুন বা প্রকৃতি বলুন–এরা কোনোরকম অস্বাভাবিকতা সহ্য করে না, এই জিনিসটি খেয়াল রাখবেন। কাজেই আমি কিছুই দেখলাম না। বৃষ্টিতে ভিজলাম, কাদায় মাখামাখি হলাম। আমার জিদ চেপে গেল। পাশের বাগানের মালীকে ডেকে এনে সেই রাতেই জায়গাটা খুঁড়লাম। কিছুই পাওয়া গেল না।

পরদিন থানায় খবর দিলাম। পুলিশের সাহায্যে আবারও খোঁড়াখুঁড়ি করা হলো। কিছুই পাওয়া গেল না। সবার ধারণা হলো আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমার বাবা খবর পেয়ে আমাকে এসে নিয়ে গেলেন। দীর্ঘদিন ডাক্তারের চিকিৎসায় থেকে সুস্থ হলাম। শুনে অবাক হবেন, এই ঘটনার পর মাসখানেক আমি ঘুমুতে পারতাম না।'

'গল্পটা কি এখানেই শেষ, না আরো কিছু বলবেন ?'

'না আর কিছু বলব না। ভাই আগেই তো বলেছি এটা কোনো ভৌতিক গল্প না। ভৌতিক গল্প হলে দেখা যেত ইয়াকুব বউটাকে মেরে ঐখানে কবর দিয়ে রেখেছিল। ভৌতিক গল্প না বলেই— ঐটা সত্যি হয়নি। তবে ঐ বাড়ি আমি কিনে নিয়েছি। বর্ষার সময় প্রায়ই ঐখানে একা একা রাত্রিযাপন করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঐ রাতে ঘটনার অংশবিশেষ আমি দেখেছিলাম। নিজের ওপর কনট্রোল হারিয়ে ফেলেছিলাম বলে বাকিটা দেখতে পারিনি। কোনো একদিন বাকিটা হয়তো দেখব। ইচ্ছা করলে আপনিও আমার সঙ্গে যেতে পারেন। আপনি কি যাবেন ?

'না আমার ভূত দেখার কোনো ইচ্ছা নেই— আপনার ঐ মালী, ইয়াকুব না কী যেন নাম বললেন ও কি এখনও ঐ বাড়িতে আছে ?'

'হ্যাঁ আছে।'

'সে আপনার ঘটনা শুনে কী বলে ?'

'এটাও একটা মজার ব্যাপার। সে কিছুই বলে না। হ্যাঁও বলে না, নাও বলে না। চুপ করে থাকে। ভালো কথা এতক্ষণ যে আমাদের ড্রিংকস দিয়ে গেল, কাজু বাদাম দিয়ে গেল তার নামই ইয়াকুব। তাকে আমি সবসময় কাছাকাছি রাখি। আপনি কি তার সঙ্গে কথা বলবেন ? ইয়াকুব, এই ইয়াকুব...।

www.BDeBooks.Com

ওইজা বোর্ড

প্রায় আট বছর পর নাসরিনের বড় ভাই আলাউদ্দিন দেশে ফিরল। সঙ্গে বিদেশি বউ। বউয়ের নাম ক্লারা। বউয়ের চুল সোনালি, চোখ ঘন নীল, মুখটাও মায়া-মায়া। তবু মেয়েটাকে কারোই পছন্দ হলো না।

যে-পরিমাণ আগ্রহ নিয়ে নাসরিন বড় ভাইয়ের জন্যে অপেক্ষা করছিল, ভাইকে দেখে সে ঠিক ততখানি নিরাশ হলো। আট বছর আগে নাসরিনের বয়স ছিল নয়, এখন সতেরো। ন'বছর বয়েসী চোখ এবং সতেরো বছর বয়েসী চোখ একরকম নয়। ন'বছর বয়েসী চোখ সবকিছুই কৌতূহল এবং মমতা দিয়ে দেখে। সতেরো বছরের চোখ বিচার করতে চেষ্টা করে। তার বিচারে ভাই এবং ভাইয়ের বউ দুজনকেই খারাপ লাগছে।

নাসরিন দেখল তার ভাই আগের মতো চুপচাপ শান্ত ধরনের ছেলে নয়— খুব হইচই করা শিখেছে। স্ত্রীকে নিয়ে সবার সামনে বেশ আহ্লাদ করছে। ঠোঁট গোল করে 'হানি' ডাকছে। অথচ 'হানি' শব্দটা বলার সময় ঠোঁট গোল হয় না।

আলাউদ্দিন এতদিন পর দেশে আসছে, আত্মীয়-স্বজনদের জন্যে উপহার-টুপহার আনা উচিত ছিল, তেমন কিছুই আনেনি। ভুসাভুসা অ্যাশ কালারের একটা সোয়েটার এনেছে মার জন্যে। সেই সোয়েটার নিয়ে কতরকম আদিখ্যেতা— পিওর উল মা। পিওর উল আজকাল আমেরিকাতেও এক্সপেনসিভ। মা তোমার কি কালার পছন্দ হয়েছে ?

নাসরিনের একবার বলার ইচ্ছা হলো— অ্যাশ কালারের পছন্দের কী আছে ভাইয়া ?

সে অবিশ্যি কিছু বলল না। তার মনটাই খারাপ হয়ে গেল। এতদিন পর আসছে। ভাইয়ার কি উচিত ছিল না মা'র জন্যে একটা ভালো কিছু আনা ?

বাবার জন্যে এনেছে ক্যালকুলেটর। যে-বাবা রিটায়ার করেছে, চোখে দেখতে পায় না, সে ক্যালকুলেটর দিয়ে কী করবে ?

নাসরিনের বড় বোন শারমিন তার দুই যমজ মেয়েকে নিয়ে সুটকেস খোলার সময় বসে ছিল। এই দু-মেয়েকে আলাউদ্দিন দেখেনি। চিঠি লিখে জানিয়েছে এই দু-মেয়ের জন্যে একই রকম দুটো জিনিস নিয়ে আসবে যা দেখে দুজনই মুগ্ধ হবে। দুজনের জন্যে দুটো গায়েমাখা সাবান বেরুল। এই সাবান ঢাকার নিউ মার্কেট ভরতি, আমেরিকা থেকে বয়ে আনতে হয় না।

আলাউদ্দিন বলল, বেশি কিছু আনতে পারিনি বুঝলি। লাস্ট মোমেন্টে ক্লারা ডিসাইড করল আমার সঙ্গে আসবে। অনেকগুলি টাকা বেরিয়ে গেল। কিছু টাকা সঙ্গেও রাখতে হয়েছে। ঢাকায় হোটেলের বিল কেমন কে জানে!

নাসরিন বলল, হোটেলের বিল মানে ? তুমি কি হোটেলে উঠবে ?

'বাধ্য হয়ে উঠতে হবে। এই গাদাগাদি ভিড়ে ক্লারার দম বন্ধ হয়ে আসছে। চট করে তো সব অভ্যাস হয় না। আস্তে আস্তে হয়। তোরা আবার এটাকে কোন ইস্যু বানিয়ে বসবি না। তোদের কাজই তো হচ্ছে সামান্য ব্যাপারটাকে কোনোমতে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে ইস্যুতে নিয়ে যাওয়া।'

নাসরিনের চোখে পানি এসে গেল। তার আপন বড় ভাই তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করবে সে স্বপ্নেও ভাবেনি। নাসরিনের চোখের পানি অবিশ্যি কেউ দেখতে পেল না। একটু আসছি ভাইয়া বলেই সে চট করে উঠে গেল। বাথরুমে কিছুক্ষণ কাটিয়ে চোখ মুছে উপস্থিত হলো। আলাউদ্দিন তখন সুটকেস খুলে আরো কীসব উপহার বের করছে। অতি তুচ্ছ সব জিনিস— গাড়ির পেছনে লাগানোর স্টিকার, যেখানে লেখা 'Hug Your Kids'। তাদের গাড়ি কোথায় যে তারা গাড়ির পেছনে স্টিকার লাগাবে ? কেউ অবিশ্যি কিছু বলল না। সবাই এমন ভাব করতে লাগল যে গাড়ির স্টিকারটার খুব প্রয়োজন ছিল।

আলাউদ্দিন বলল, নাসরিন তোর জন্যে তো কিছু আনা হয়নি।

নাসরিন বলল, ভাইয়া আমার কিছু লাগবে না।

'তোকে বরং এখান থেকেই শাড়ি-টাড়ি কিছু কিনে দেব।'

www.BDeBooks.Com

'আচ্ছা।'

আলাউদ্দিন সুটকেস ঘাঁটতে লাগল। তার ঘাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হয় সে আশা করছে কিছু একটা পেয়ে যাবে যা নাসরিনকে দিতে পারলে শাড়ির ঝামেলায় যেতে হবে না। নাসরিনের লজ্জার সীমা রইল না।

'এই যে জিনিস পাওয়া গেছে।'

হাসিতে আলাউদ্দিনের মুখ ভরে গেল। সবাই ঝুঁকে পড়ল সুটকেসের ওপর। লিপস্টিকের মতো একটা বস্তু বেরুল। আলাউদ্দিন বলল— নাসরিন নে। এর নাম লিপ গ্লস। ঠোঁটে দিলে ঠোঁট চকচক করে, ঠোঁট ফাটে না।

নাসরিন শুকনো গলায় বলল, থ্যাংকস ভাইয়া।

আলাউদ্দিন বিরক্ত গলায় বলল— গিফট হচ্ছে গিফট। গিফটের মধ্যে সস্তা দামি কোনো ব্যাপার না। বাঙালিদের স্বভাব হচ্ছে কোনো উপহার পেলেই হিসাব-নিকাশে বসে যাবে। দাম কত, কী!

নাসরিন বলল, আমি কোনো হিসাব-নিকাশ করছি না ভাইয়া। লিপ গ্লসটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

'দ্যাটস গুড। মাই গড— নাসরিন তোর ভাগ্য ভালো আরেকটা জিনিস পাওয়া গেছে— ওইজা বোর্ড। এতক্ষণ চোখেই পড়েনি।'

'ওইজা বোর্ড আবার কী ?'

আলাউদ্দিন লুডু বোর্ডের মতো একটা বোর্ড মেলে ধরল। চারদিকে 'এ' থেকে 'জেড' পর্যন্ত লেখা— মাঝখানে দুটা ঘর— একটায় লেখা 'ইয়েস' একটায় 'নো'।

'এটা কি কোনো খেলা ভাইয়া ?'

খেলাই বলতে পারিস। ভূত নামানোর খেলা। প্ল্যানচেটের নাম শুনিসনি ? এটা দিয়ে প্ল্যানচেটের মতো করা যায়।'

'কীভাবে ?'

'লাল বোতামটা দেখছিস না ? দুজন বা তিনজন মিলে খুব হালকাভাবে তর্জনী দিয়ে এটাকে টাচ করে রাখবি, কোনোরকম প্রেশার দেয়া যাবে না। বোতামটাকে রাখবি বোর্ডের ঠিক মাঝখানে। ঘরের আলো কমিয়ে দিবি আর মনে-মনে বলবি— 'If any good soul passes by, please come.' তখন আত্মাটা বোতামে চলে আসবে। বোতাম নড়তে থাকবে। তখন কোনো প্রশ্ন করলে আত্মা জবাব দেবে।'

'কীভাবে জবাব দেবে ?'

'বোতামটা অক্ষরগুলির উপর যাবে। কোন কোন অক্ষরের উপর যাবে সেটা খেয়াল রাখতে হবে। ভূতটার নাম যদি হয় রহিম তা হলে প্রথমে যাবে 'আর'-এর উপর, তারপর 'এ'-এর উপর, তারপর 'এইচ'— বুঝতে পারছিস ?'

'বোতামটা আপনাআপনি যাবে ?'

'না, আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে রাখতে হবে।'

'ভাইয়া ভূত কি সত্যি সত্যি আসে ?'

'আরে দূর দূর। ভূত আছে নাকি যে আসবে! আমেরিকানদের এটা হচ্ছে পয়সা বানানোর একটা ফন্দি। এত সহজে আত্মা চলে এলে তো কাজই হতো!'

আলাউদ্দিন আমেরিকানদের স্বভাবচরিত্র সম্পর্কে মজার মজার গল্প করতে লাগল। আলাউদ্দিনের মা রাহেলার মনে ক্ষীণ আশা— গল্প যেভাবে জমেছে তাতে মনে হয় না ছেলে বউকে নিয়ে হোটেলে যাবে। যদি সত্যি সত্যি যায় তা হলে তিনি মানুষের কাছে মুখ দেখাতে পারবেন না। এমনিতেই বিদেশী বউয়ের কথায় অনেকেই হাসাহাসি করছে। জামশেদ সাহেবের স্ত্রী গত সপ্তাহে এসে সরু গলায় বললেন— বাঙালি ছেলেরা যে বিদেশে গিয়েই বিদেশিনী বিয়ে করে ফেলে ঐসব বিদেশিনীগুলি নিচু জাতের। ঝি, জমাদারনি এইসব। ভদ্রলোকের মেয়েরা বাঙালি বিয়ে করতে যাবে কেন ? ওদের গরজটা কী ?

রাহেলা ক্ষীণ গলায় বললেন, 'আপনাকে কে বলেছে ?'

'বলবে আবার কে ? এ তো সবাই জানে। বাঙালি ছেলেগুলির সাদা চামড়া দেখে আর হুঁশ থাকে না। ওরা তো প্রথম প্রথম জানে না যে ঐ দেশের ঝিয়ের চামড়াও সাদা, আবার মেথরানির চামড়াও সাদা।'

রাহেলা এইসব কথার কোনো জবাব দিতে পারেননি। শুধু শুনে গেছেন। এখন যদি ছেলে বউ নিয়ে হোটেলে চলে যায় তা হলে কী হবে ? সবাই তো গায়ে থুথু দেবে।

অবিশ্যি তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন ছেলে এবং ছেলের বউয়ের জন্যে একটা ঘর ভালোমতো সাজাতে। নাসরিনের ঘরটাই সাজাতে হয়েছে। দেয়ালে চুনকাম করা হয়েছে। টিউবলাইট লাগানো হয়েছে। একটা ফ্যান ঘরে আছে। সেই ফ্যান ঘটাং ঘটাং শব্দ হয় বলে নতুন একটা সিলিং ফ্যান কেনা হয়েছে। তারপরেও যদি ছেলে বউ নিয়ে হোটেলে ওঠে তিনি কী আর করবেন ? তাঁর আর কী করার আছে ?

www.BDeBooks.Com

রাতের খাওয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আলাউদ্দিন বলল, আমরা তাহলে উঠি মা।

রাহেলা ক্ষীণ গলায় বললেন, কোথায় যাবি ?

আলাউদ্দিন বিরক্ত গলায় বলল, কোথায় যাবি বলছ কেন মা ? আগেভাগে তো বলেই রেখেছি একটা ভালো হোটেলে উঠতে হবে। ক্লারা গতরাতে এক ফোঁটাও ঘুমায়নি। বেচারি গরমে সেদ্ধ হয়ে গেছে। বাতাস নেই এক ফোঁটা।

'ফ্যান তো আছে।'

'বাতাস গরম হয়ে গেলে ফ্যানে লাভ কী ? তোমরা গরম দেশের মানুষ ওর কষ্টটা কী বুঝবে ? আমি নিজেই সহ্য করতে পারছিলাম না, আর ও...'

'বউকে নিয়ে হোটেলে গিয়ে উঠলে লোকে নানান কথা বলবে।'

আলাউদ্দিন এই কথায় রাগে জ্বলতে লাগল। হড়বড় করে এমন কথা বলতে লাগল যার তেমন কোনো অর্থ নেই।

তার বাবা মনসুর সাহেব যিনি কখনোই কিছু বলেন না তিনি শেষ পর্যন্ত বলে ফেললেন— তুই খামাকা চিৎকার করছিস কেন ?

'আমি খামাখা চিৎকার করছি ? আমি খামাখা চিৎকার করছি ? আমি শুধু বলছি লোকজনের কথা নিয়ে তোমরা নাচানাচি কর কেন ? তোমরা যদি না খেয়ে মর লোকজন এসে তোমাদের খাওয়াবে ? প্রতি মাসে দেড়শো ডলারের যে মানি অর্ডারটা পাও সেটা কি লোকজন দেয় ? বলো দেয় লোকজন ?'

মনসুর সাহেব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সিগারেট ধরিয়ে বললেন, যা যেখানে যেতে চাস। আলাউদ্দিন তিক্ত গলায় বলল, তোমরা যে ভাবছো ছেলে ঘর ছেড়ে হোটেলে চলে যাচ্ছে, কাজেই ছেলে পর হয়ে গেল— এটা ঠিক না।

'আমরা কিছু ভাবছি না। তুই আর ভ্যাজভ্যাজ করিস না। মাথা ধরিয়ে দিয়েছিস।'

মাথা ধরিয়ে দিয়েছি ? আমি মাথা ধরিয়ে দিয়েছি ?'

আট বছর পর ফিরে আসা পুত্রের সঙ্গে দ্বিতীয় রাতেই বাড়ির সদস্যদের খণ্ড প্রলয়ের মতো হয়ে গেল। নাসরিন মনে-মনে বলল, বেশ হয়েছে। খুব মজা হয়েছে। আমি খুব খুশি হয়েছি।

ক্লারা ঝগড়ার ব্যাপারটা কিছুই বুঝল না। একবার শুধু ভ্রু কুঁচকে বলল, তোমরা এত চেঁচিয়ে কথা বলো কেনো ? বলেই জবাবের অপেক্ষা না

করে বসার ঘরে টিকটিকি দেখতে গেল। বাংলাদেশের এই ছোট্ট প্রাণী তার হৃদয় হরণ করেছে। সে টিকটিকির একুশটা ছবি এ পর্যন্ত তুলেছে। ম্যাকরো লেন্স আনা হয়নি বলে খুব আফসোসও করছে। ম্যাকরো লেন্সটা থাকলে ক্লোজআপ নেয়া যেত।

খুব সঙ্গত কারণেই গভীর রাত পর্যন্ত এ পরিবারের কোনো সদস্য ঘুমুতে পারল না। বারান্দায় বসে রাহেলা ক্রমাগত অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলেন। একসময় মনসুর সাহেব বললেন, আর কেঁদো না, চোখে ঘা হয়ে যাবে। তোমার ছেলের আশা ছেড়ে দাও। বিদেশী পেতনি বিয়ে করে ধরাকে সরা দেখছে। হারামজাদা।

নাসরিন আজ ওর ঘরে ঘুমুতে পারছে।

ঘরে ঢুকে তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। কত আগ্রহ করে তারা সবাই মিলে ঘর সাজিয়ে দিয়েছে তবু ভাইয়ার পছন্দ হলো না। এই ঘরটা কি হোটেলের চেয়ে কম সুন্দর হয়েছে! মাথার পাশে টেবিল-ল্যাম্প। পায়ের দিকের দেয়ালে সূর্যাস্তের ছবি। খাটের পাশে মেরুন রঙের বেডসাইড কার্পেট। জানালা খুলে ফুল স্পিডে ফ্যান ছেড়ে দিলে খুব একটা গরম কি লাগে ? কই, তার তো লাগছে না! তার তো উলটো কেমন শীত-শীত লাগছে।

সে টেবিল-ল্যাম্প জ্বালাল। এত বড় খাটে একা ঘুমুতে কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। ভাইয়া থাকবে না জানলে বড় আপাকে জোর করে রেখে দিত। নাসরিন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। আজ রাতটা তাদের জন্যে খুব খারাপ রাত। আজ রাতে তাদের কারোরই ঘুম হবে না। একা একা জেগে থাকা খুব কষ্টের।

ভূত নামালে কেমন হয় ? ওইজা বোর্ড খুলে সে যদি বোতামটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে বসে থাকে তা হলে কি কিছু হবে ? যদি কোনো আত্মা চলে আসে ভালোই হয়। আত্মার সঙ্গে গল্প করা যাবে। মুশকিল হচ্ছে এই আত্মাগুলি আবার কথা বলে না। বোতাম ঠেলে ঠেলে মনের ভাব প্রকাশ করে।

নাসরিন দরজা বন্ধ করে ওইজা বোর্ড নিয়ে বসল। তর্জনী দিয়ে বোতামটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে নরম গলায় বলল, আমার আশপাশে যদি কোনো বিদেহী আত্মা থাকেন তা হলে তাঁদের মধ্যে একজন কি দয়া করে আসবেন ? যদি আসেন তা হলে আমার মনটা একটু ভালো হবে। কারণ আজ আমার মনটা খুব খারাপ। কেন খারাপ তা তো আপনারা খুব ভালো

www.BDeBooks.Com

করেই জানেন। পুরো ঘটনার সময় নিশ্চয়ই আপনারা আশপাশে ছিলেন। ছিলেন না ? এই পর্যন্ত বলেই নাসরিন চমকে উঠল। ডান হাতটা একটু যেন কাঁপছে।

বোতামটা কি নড়তে শুরু করেছে ? অসম্ভব, হতেই পারে না। এ কী, বোতামটা এগিয়ে গেল কীভাবে ? নাসরিন নিজেই হয়তো নিজের অজান্তে বোতাম ঠেলে ঠেলে নিয়ে গেছে। খানিকটা ভয় এবং খানিকটা অস্বস্তি নিয়ে নাসরিন অপেক্ষা করছে। হচ্ছেটা কী ?

বোতাম 'ইয়েস' লেখা ঘরে কিছুক্ষণ থেমে আবার আগের জায়গায় ফিরে এল। নাসরিন শব্দ করেই বলল, বাহ্ বেশ মজা তো! পরবর্তী কিছুক্ষণ 'ইয়েস' এবং 'নো'তে বোতাম ঘুরতে লাগল। নাসরিনের শুরুর ভয় খানিকটা কমে গেল। যদিও তখনও বুক ধক ধক করছে।

ওইজা বোর্ডে 'ইয়েস' এবং 'নো' ছাড়া আরো দুটি ঘর আছে সেগুলি হচ্ছে– 'আমি উত্তর দেব না', 'আমি জানি না'। বোতামটা এইসব ঘরেও মাঝে মাঝে এল। প্রশ্ন এবং উত্তর এইভাবে সাজানো যায়—

'আপনি কি এসেছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি এই বাড়িতেই থাকেন ?'

'না।'

'আপনি কোথায় থাকেন ?'

'আমি উত্তর দেব না।'

'আজ আমাদের সবার খুব মন-খারাপ সেটা কি আপনি জানেন ?'

'না।'

'কীজন্যে আমাদের মন খারাপ সেটা কি বলব ?'

'না।'

'শুধু না-না করছেন কেন ? একটু শুনলে কী হয় ? বলি ?'

'হ্যাঁ।'

'তার আগে বলুন আপনার নাম কী ?'

বোতামটা ঘুরতে ঘুরতে এক্স ঘরে গিয়ে থামল। নাসরিন বলল, এক্স দিয়ে বুঝি কারোর নাম হয় ? ঠিক করে নাম বলুন।

'আমি জানি না।'

'আপনি জানেন না মানে ? আপনার কি নাম নেই ?'

'না।'

BDeBooks.com

'ভূতদের নাম থাকে না ?'

'আমি জানি না।'

'সে কী, আমার তো ধারণা প্রেতাত্মারা সব জানে। আর আমি আপনাকে যাই জিজ্ঞেস করছি— আপনি বলছেন আমি জানি না। আচ্ছা বলুন তো উনিশকে তিন দিয়ে গুণ দিলে কত হয় ?'

'আমি জানি না।'

'আমি জানি না। তবে আপনি যদি বলতেন তা হলে গুণ করে বের করতাম। আপনি কি গুণ অংক জানেন ?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা আত্মাদের কি অংক করতে হয় ?'

বোতাম এক জায়গায় স্থির হয়ে রইল। উত্তর দিল না। নাসরিন বলল, আপনি কি আমার ওপর রাগ করেছেন ?

'হ্যাঁ।'

'প্লিজ আমার ওপর রাগ করবেন না। কেউ আমার সাথে রাগ করলে আমার খুব মন-খারাপ থাকে। এমনিতেই আজ আমার খুব মন-খারাপ। আপনি কি জানেন আমার যে মন-খারাপ ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন মন-খারাপ সেই ঘটনাটা বলি ? বলব ?'

'হ্যাঁ।'

নাসরিন আজ সারাদিনের ঘটনা বলতে শুরু করল। বলতে বলতে দুবার কেঁদে ফেলল। তার কাছে একবারও মনে হলো না সে হাস্যকর একটা কাণ্ড করছে। এইসব গল্প বোতামটাকে বলার কোনো মানে আছে ?

নাসরিন ঘুমুতে গেল রাত তিনটায়। খুব চমৎকার ঘুম হলো। ঘুমিয়ে এত তৃপ্তি অনেকদিন সে পায়নি। তবে ঘুমের মধ্যে সারাক্ষণই মনে হলো একজন বুড়োমানুষ তার গায়ে হাত রেখে শুয়ে আছেন। বুড়োমানুষটার শরীরে চুরুটের কড়া গন্ধ।

২

ভোর সাতটায় আলাউদ্দিন এসে উপস্থিত।

সে ভোর হতেই বাসায় চলে আসবে রাহেলা তা ভাবেননি। আগের রাতের সব দুঃখ তিনি ভুলে গেলেন। হাসিমুখে বললেন, বউমাকে আনলি না ?

www.BDeBooks.Com

'ও ঘুমুচ্ছে। ঘুম ভাঙলে চলে আসবে। নোট লিখে এসেছি।'

'আসতে পারবে একা একা ?'

'আসতে পারবে না মানে ? কী যে তুমি বল মা! ও কি আমাদের দেশের মেয়ে যে স্বামী ছাড়া এক পা ফেলতে পারে না!'

'তা তো ঠিকই।'

রাহেলা নাশতার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আলাউদ্দিনকে এখন সহজ ও স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। রান্নাঘরে মা'র পাশে বসে অনেক গল্প করতে লাগল। নাসরিন এবং মনসুর সাহেবও গল্পে যোগ দিলেন।

'তুই তো ঐ দেশেই থেকে যাবি ?'

'হ্যাঁ। এই দেশে আছে কী বলো ? এই দেশে থাকলে তো মরতে হবে না-খেয়ে।'

'অনেকেই তো আছে।'

'কীরকম আছে তা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'তাও ঠিক।'

নাসরিনও সহজভাবে ভাইয়ের সঙ্গে অনেক গল্প করল। এখন ভাইয়াকে খুব আপন লাগছে। কথা বলতে ভালো লাগছে।

'ভাইয়া, কাল ওইজা বোর্ড দিয়ে ভূত এনেছিলাম।'

'তা-ই নাকি ?'

'হ্যাঁ। আপনাআপনি বোতাম এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যায়।'

'তুই নিশ্চয়ই ঠেলেছিস।'

'অনেস্ট ভাইয়া। মোটেই ঠেলিনি।'

'তুই না ঠেললেও তোর সাবকনশাস মাইন্ড ঠেলেছে। আমি নিউজ উইক পত্রিকায় দেখেছিলাম— পুরো ব্যাপারটাই আসলে সাব-কনশাস মাইন্ডের।'

এমন সহজ স্বাভাবিকভাবে যে মানুষটা গল্প করল সেই আবার ঠিক সন্ধ্যাবেলা একটা ঝগড়া বাধিয়ে বসল। সাধারণ ঝগড়া না— কুৎসিত ঝগড়া। ব্যাপারটা এরকম

ক্লারা খাবার পানি চেয়েছে।

নাসরিন গ্লাসে করে পানি দিয়েছে। এক চুমুকেই সেই পানি খেয়ে ক্লারা বলল— থ্যাংকস। খুব বালো পানি।

ক্লারা এখন কিছু কিছু বাংলা বলার চেষ্টা করে।

আলাউদ্দিন বলল, ফোটানো পানি দিয়েছিস তো ? বয়েলড ওয়াটার ?

'না ভাইয়া। ট্যাপের পানি।'

'কেন ? তোদের কি আগে বলিনি সবসময় বয়েলড পানি দিবি ? পানি ফুটিয়ে পরে বোতলে ভরে রাখবি। সামান্য কথাটা মনে থাকে না ? বয়স যত বাড়ছে তোর বুদ্ধি দেখি তত কমছে!'

নাসরিনের মুখ কালো হয়ে গেল।

মনসুর সাহেব মেয়েকে রক্ষা করার জন্যে বললেন, একবার মাত্র খেয়েছে কিচ্ছু হবে না। আমরা তো সব সময় খাচ্ছি।

'তোমাদের খাওয়া আর ক্লারার খাওয়া এক হলো ? মাইক্রো অরগেনিজম খেয়ে খেয়ে তোমরা ইমমিউন হয়ে আছ। ও তো হয়নি।'

'যা হবার হয়ে গেছে। এখন চিৎকার করে আর কী হবে ?'

'চিৎকার করছি নাকি ? তোমাদের সঙ্গে দেখি সামান্য আরগুমেন্টও করা যায় না!'

নাসরিন অনেক চেষ্টা করেও কান্না আটকাতে পারল না। মুখে শাড়ির আঁচল গুঁজে দ্রুত বের হয়ে গেল। রাহেলা মৃদুস্বরে বললেন, দিলি তো মেয়েটাকে কাঁদিয়ে! যা অভিমানী মেয়ে! রাতে তো খাবেই না।

আলাউদ্দিন বিরক্ত গলায় বলল, এত অল্পতেই যদি চোখে পানি এসে যায় তা হলে তো মুশকিল। একটা ভুল করলে তার ভুল ধরিয়ে দেয়া যাবে না ?

'ও ছেলেমানুষ।'

'ছেলেমানুষ কী বলছ ? সতেরো আঠারো বছরের কেউ ছেলেমানুষ থাকে ? তোমাদের জন্যে বড় হতে পারে না। তোমরা ছেলেমানুষ বানিয়ে রেখে দাও।'

আলাউদ্দিন রাতে খেল না। বউকে নিয়ে নাকি নিরিবিলি কোথাও ডিনার করবে।

নাসরিন সেই রাতে ঘুমুতে গেল না-খেয়ে। অনেকক্ষণ জেগে রইল, ঘুম এল না। তার খুব কষ্ট হচ্ছে। মরে যেতে ইচ্ছা করছে। অনেক রাতে সে ওইজা বোর্ড নিয়ে বসল। আজ আর দেরি হলো না। বোতামে হাত রাখামাত্র বোতাম নড়তে লাগল। আজ সে উত্তরগুলিও শুধু 'হ্যাঁ' বা 'না' দিয়ে দিচ্ছে না। অক্ষরের উপর ঘুরে ঘুরে ছোট ছোট শব্দ তৈরি করছে। মজার মজার শব্দ। নাসরিন এই শব্দগুলিকে গুরুত্ব দিচ্ছে না আবার গুরুত্ব

www.BDeBooks.Com

দিচ্ছে। একবার ভাবছে— এগুলি অবচেতন মনের ইচ্ছে, আরেকবার ভাবছে— হতেও তো পারে। হয়তো সত্যি কেউ এসেছে। পৃথিবীতে রহস্যময় ব্যাপারটা তো হয়। ক'টা রহস্যের সমাধান আমরা জানি ? কী যেন বলেছেন শেকসপিয়ার— There are many things.....

'আপনি কি এসেছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'কাল যিনি এসেছিলেন আজও কি তিনিই এসেছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার নাম ?'

'X'

'কী অদ্ভুত নাম! আচ্ছা আপনি কি জানেন আজ আমার মন কালকের চেয়েও খারাপ ?'

'জানি।'

'কী করা যায় বলুন তো ?'

'আমি জানি না।'

'আপনি কি জানেন আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার খুব ভালো লাগে।'

'জানি।'

'ভাইয়া বলছিল এই যে আপনি নানান কথা বলছেন এগুলি আসলে আমার মনের অবচেতন ইচ্ছার প্রতিফলন।'

'হতে পারে।'

'ভাইয়াকে আমার দারুণ পছন্দ।'

'আমি জানি।'

'ঐ পচা মেয়েটা সব নষ্ট করে দিয়েছে। আমার মনে হয় মেয়েটা ডাইনি। ও আশপাশে থাকলেই ভাইয়া অন্যরকম হয়ে যায়। তখন সবার সঙ্গে ঝগড়া করে।'

'জানি।'

'কী করা যায় বলুন তো।'

'মেয়েটাকে মেরে ফ্যালো।'

'ছিঃ, কী যে বলেন! মানুষকে মেরে ফেলা যায় নাকি ?'

'হ্যাঁ, যায়।'

'কীভাবে ?'

'অনেকভাবে।'

'আপনার কথাবার্তার কোনো ঠিক নেই। আপনি কী করে ভাবলেন আমি একটা মানুষ মারতে পারি ?'

'সবাই পারে।'

'আপনি পারেন ?'

'না।'

'আপনি পারেন না কেন ?'

'আমি জানি না।'

'মানুষ মারা যে মহাপাপ এটা কি আপনি জানেন ?'

'আমি জানি না।'

'আপনি আসলে কিছুই জানেন না।'

'হতে পারে।'

'তা ছাড়া আপনি আরেকটা জিনিস ভুলে যাচ্ছেন— ধরুন আমি ঐ পচা মেয়েটাকে মেরে ফেললাম, তখন পুলিশ আমাকে ছেড়ে দেবে ? আমাকে ধরে নিয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে না ?'

'তা দিতে পারে।'

'আর ভাইয়ার অবস্থাটা তখন চিন্তা করে দেখুন। কীরকম রাগ সে করবে। টাকা-পয়সা দেয়া বন্ধ করে দেবে। আমরা তখন না-খেয়ে মারা যাব। বাবার এক পয়সা রোজগার নেই, আমাদের ব্যাংকে টাকা-পয়সা নেই। ভাইয়া প্রতি মাসে যে টাকা পাঠায় এটা দিয়ে আমরা চলি। ভাইয়া প্রতি মাসে কত পাঠায় বলুন তো ?'

'আমি জানি না।'

'একশো ডলার। একশো ডলারে বাংলাদেশী টাকায় কত হয় তা জানেন ?'

'না।'

'বেশি না, সাড়ে তিন হাজার। মা এবার কী ঠিক করে রেখেছেন জানেন ? মা ঠিক করে রেখেছেন— ভাইয়াকে বলবেন আরো কিছু বেশি টাকা পাঠাতে। একশো ডলারে হচ্ছে না। জিনিসপত্রের যা দাম। আপনাদের তো আর কোনোকিছু কিনতে হয় না। আপনারা আছেন সুখে, তা-ই না ?'

www.BDeBooks.Com

'আমি জানি না।'

'আচ্ছা আপনার কী মনে হয় ভাইয়া টাকার পরিমাণ বাড়াবে ?'

'আমি জানি না।'

'না বাড়ালে আমাদের খুব কষ্টের মধ্যে পড়তে হবে। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে বাড়াবে না। বিয়ে করেছে, খরচ বেড়েছে। তাই না ?'

'হতে পারে।'

'টাকা না বাড়ালে কী হবে বলুন তো! আমার আরেক ভাই আছেন– জসিম ভাইয়া। চিটাগাঙে থাকেন। তাঁর টাকা-পয়সা ভালোই আছে। কিন্তু সে আমাদের একটা পয়সা দেয় না। আমরা যদি না খেয়ে মরেও যাই সে ফিরে তাকায় না। কী করা যায় বলুন তো ?

'ক্লারাকে মেরে ফেলা যাক।'

'বারবার আপনি এক কথা বলেন কেন ? আপনার কাছে বুদ্ধি চাচ্ছি।'

'ক্লারাকে মেরে ফেলাই একমাত্র বুদ্ধি।'

'যান। আপনার সাথে আর কথাই বলব না।'

নাসরিন ওইজা বোর্ড বন্ধ করে ঘুমুতে গেল। আজ আর গতরাতের মতো চট করে ঘুম এল না। একটু যেন ভয়-ভয় করতে লাগল। ওইজা বোর্ড টেবিলের ওপর রাখা হয়েছে। তার কাছেই একটা চেয়ার। নাসরিনের কেন জানি মনে হচ্ছে চেয়ারে ঐ মি. এক্স বসে আছেন। বুড়ো ধরনের একজন মানুষ, যার গায়ে চুরুটের গন্ধ। ঐ বুড়ো মানুষটার একটা চোখে ছানিপড়া। গায়ে চামড়ার কোট। সেই কোটেও এক ধরনের ভ্যাপসা গন্ধ।

নাসরিন কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু তার স্পষ্ট মনে হচ্ছে কেউ-একজন আছে।

নাসরিন ভয়ে-ভয়ে বলল, আপনি কি আছেন ? চেয়ার নড়ে উঠল। সত্যি নড়ল ? না মনের ভুল ? নাসরিন ক্ষীণ স্বরে বলল, আপনি দয়া করে বসে থাকবেন না। চলে যান। যখন আপনাকে দরকার হবে আমি ডাকব।

আবার চেয়ার নড়ল। নিশ্চয়ই মনের ভুল।

নাসরিনের বড় ভয় লাগছে। জুন মাসের এই প্রচণ্ড গরমের রাতেও একটা চাদরে সারা শরীর ঢেকে সে শুয়ে রইল। ঘুম এল একেবারে শেষ রাতে। তাও গাঢ় ঘুম না। আজেবাজে সব স্বপ্ন। একটা স্বপ্ন তো খুবই ভয়ংকর। তার শাড়িতে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। সে অনেক চেষ্টা করছে আগুন নেভাতে। পারছে না। যতই চেষ্টা করছে আগুন আরো ছড়িয়ে

পড়ছে। একজন বুড়োমতো লোক চুরুট-হাতে পুরো ব্যাপারটা দেখছে, কিছুই করছে না।

টাকার পরিমাণ বাড়ানোর দাবি রাহেলা অনেক ভণিতার পর করলেন। বলতে তাঁর খুবই লজ্জা লাগল, কিন্তু কোনো উপায় নেই।

আলাউদ্দিন তখন চা খাচ্ছিল। চায়ের কাপ নামিয়ে বিস্মিত গলায় বলল, টাকা বাড়াতে বলছ ?

'হ্যাঁ।'

'একশো ডলারে তোমাদের হচ্ছে না ?'

'না।'

'তোমরা কি পাগল-টাগল হয়ে গেলে ? আমেরিকায় কি আমি টাকার চাষ করছি ? ট্রাকটার দিয়ে জমি চষে টাকার চারাগাছ বুনে দিচ্ছি ?'

রাহেলা ক্ষীণস্বরে বললেন, সংসার অচল।

'সংসার তো আমারটা আরো বেশি অচল। বিয়ে করেছি— নতুন সংসার। অ্যাপার্টমেন্ট নিয়েছি। একটা জিনিস নেই অ্যাপার্টমেন্টে। ক্লারা অফিস করে, তার একটা আলাদা গাড়ির দরকার। তোমাদের টাকা তো বাড়াতে পারবই না, বরং কিছু কমিয়ে দেব বলে ভাবছি।'

'আমাদের চলবে কীভাবে ?'

'জসিম ভাইকে বলো। তারও তো কিছু দায়িত্ব আছে। সে তো গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরছে।'

রাহেলা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আলাউদ্দিন বিরক্ত স্বরে বলল, এরকম ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবে না মা। নিশ্বাস ফেলে সমস্যার সমাধান হয় না।

৩

নাসরিন ওইজা বোর্ড নিয়ে বসেছে। রাত প্রায় দুটো। আজ অন্যদিনের মতো গরম নয়। সন্ধ্যাবেলায় তুমুল বর্ষণ হয়েছে। আকাশ মেঘলা। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আবারও হয়তো বৃষ্টি হবে। বৃষ্টির ছাঁট আসছে বলে জানালা বন্ধ।

'আপনি কি আছেন ?'

'হ্যাঁ।'

www.BDeBooks.Com

'আমাদের কী বিপদ হয়েছে শুনেছেন ?'

'না।'

'ভাইয়া টাকা-পয়সা বেশি তো পাঠাবেই না; বরং আরো কমিয়ে দেবে।'

'ও আচ্ছা।'

'কী করব আমরা বলুন তো ?'

'মেয়েটাকে মেরে ফ্যালো।'

'এইটা ছাড়া বুঝি আপনার মাথায় আর বুদ্ধি নেই ?'

'না। এটা সবচেয়ে ভালো বুদ্ধি।'

'আপনার সঙ্গে আমার কথা বলতেই ইচ্ছা করছে না।'

'শুনে দুঃখিত হলাম।'

'আচ্ছা ঐদিন আপনি আমাকে ভয় দেখালেন কেন ? আপনি কি ঐ চেয়ারটায় বসেছিলেন ? আমার মনে হয় আপনি এখনও চেয়ারটায় বসে আছেন।'

'ক্লারাকে আগুনে পুড়িয়ে মারলে কেমন হয় ?'

'আপনি আজেবাজে কথা বলবেন না তো! আচ্ছা বলুন তো ঐদিন কি আপনি চেয়ারে বসেছিলেন ?'

'তুমি একটু সাহায্য করলেই হয়।'

'কী সাহায্য ?'

'যখন আগুন জ্বলে উঠবে তখন এই ঘরের দরজা তুমি বাইরে থেকে বন্ধ করে দেবে।'

'আপনার কথাবার্তার আগামাথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আগুন লাগার পর মেয়েটা যাতে বেরুতে না পারে।'

'কী বলছেন আপনি ?'

'আগুন লাগার পর সে ছুটে বের হতে চাইবে। তখন তাকে শুধু আটকানো। অল্প কিছুক্ষণ আটকে রাখা।

'চুপ করুন তো!'

'ভালো বুদ্ধি দিচ্ছি।'

'আপনার বুদ্ধি চাই না।'

'তুমি আমার বন্ধু।'

'না, আমি আপনার বন্ধু নই।'

আজ রাতে নাসরিন এক পলকের জন্যেও চোখ এক করতে পারল না। মনে মনে ঠিক করে ফেলল ওইজা বোর্ডটা ভোর হতেই আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলবে। কী সর্বনাশের কথা! বোতামটা এমন অদ্ভুত কথা বলছে কেন ?

৪

আগামীকাল রাত দুটার ফ্লাইটে আলাউদ্দিন চলে যাবে। শেষ রাতটা এ বাড়িতে থাকবার জন্যে এসেছে, দীর্ঘদিন হোটেলে থাকায় তাকে বেশ লজ্জিতও মনে হচ্ছে।

আজ রাতটা থাকতে তেমন কষ্ট হবে না। বর্ষা শুরু হয়ে গেছে। আবহাওয়া অসহনীয় নয়। ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে।

আলাউদ্দিন বসার ঘরে সবার সঙ্গে গল্প করছে। গল্প বেশ জমে উঠেছে। প্রথমদিকে আমেরিকায় সে কীসব বিপদে পড়েছিল তার গল্প। প্রতিটি গল্পই আগে অনেকবার শোনা তবু সবাই খুব আগ্রহ করে শুনছে।

ঘরে ইলেকট্রিসিটি নেই। বিকেলে ঝড়বৃষ্টির সময় ইলৈকট্রিসিটি চলে গিয়েছে, এখনও আসেনি। আজ রাতে আর আসবে বলে মনে হয় না। ঝড়বৃষ্টি এখনও হচ্ছে। বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ, বৃষ্টির ঝমঝমানি, দমকা হাওয়ার ঝাপটা, চমৎকার পরিবেশ।

একটিমাত্র হারিকেন, সেটা বসার ঘরে। হারিকেন ঘিরে সবাই বসে আছে।

ক্লারা ওদের গল্পে কোনো মজা পাচ্ছিল না, ঘন ঘন হাই তুলছিল। মাঝরাতে সে ঘুমুতে গেল। নাসরিন তার ঘরে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেল।

দুর্ঘটনা ঘটল তারও মিনিট দশেক পর, গল্প তখন খুব জমে উঠেছে। শুরু হয়েছে ভূতের গল্প। রাহেলা ছোটবেলায় নিশির ডাক শুনে ঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়েছিলেন সেই গল্প হচ্ছে। গা ছমছমানো পরিবেশ। ঠিক তখন তীক্ষ্ণ গলায় নাসরিন বলল, ঘর এত আলো হয়ে গেছে কেন ভাইয়া ? তার কথা শেষ হবার আগেই শোনা গেল গোঙানি ও চিৎকার। দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে এবং ক্লারা চ্যাঁচাচ্ছে— Oh God, Oh Good.

সবাই ছুটে গেল শোবার ঘরের দিকে। দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে।

www.BDeBooks.Com

দুর্ঘটনা তো বটেই। দুর্ঘটনা ছাড়া কিছুই নয়। বাতাসে মোমবাতি কাত হয়ে পড়ে গিয়েছিল নেটের মশারিতে। সেখান থেকে ক্লারার নাইট গাউনে। সিনথেটিক কাপড়— মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে উঠল। খুবই সহজ ব্যাখ্যা। শুধু একটি ব্যাপার ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। ক্লারার ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ ছিল। কেউ একজন বাইরে থেকে শিকল তুলে দিয়েছিল। আগুন লেগে যাবার পর ক্লারা প্রাণপণ চেষ্টা করেছে ঘর থেকে বেরুতে। বেরুতে পারেনি। চিৎকার করে দরজা খুলতে বলেছে— ঝড়-বৃষ্টি এবং বজ্রপাতের সঙ্গে তার চিৎকারও কেউ শোনেনি। ব্যাকুল হয়ে শেষ মুহূর্তে সে ঈশ্বরকে ডাকছিল। ঈশ্বর মানুষের কাতর আহ্বানে সাধারণত বিচলিত হন না।

সে

আমার ছোট মেয়ের গলায় মাছের কাঁটা ফুটেছিল।

মাছের কাঁটা যে এমন যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার তা জানা ছিল না। বেচারি ক্রমাগত কাঁদছে। কিছুক্ষণ পরপর বমি করছে, হেঁচকি উঠছে। চোখ-মুখ ফুলে একাকার। আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম।

অনেক ধরনের লৌকিক চিকিৎসা করানো হলো। শুকনো ভাতের দলা গেলানো, মধু খাওয়ানো, গলায় সেঁক। এক পর্যায়ে আমাদের কাজের মেয়েটি বলল, একটা বিড়াল এনে তার পায়ে ধরলে কাঁটা চলে যাবে। গ্রামদেশে নাকি এইভাবে গলার কাঁটা দূর করা হয়।

বিপদে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না। হাতের কাছে বেড়াল থাকলে হয়তোবা বেড়াল চিকিৎসাও করাতাম। ডাক্তারের কথা একবারও মনে হয়নি। কারণ মনে হলেও লাভ হতো না। আটচল্লিশ ঘণ্টার হরতাল চলছে। ঢাকা শহর অচল। পুলিশের সঙ্গে জনতার কিছু কিছু খণ্ডসংঘর্ষ হচ্ছে বলেও খবর আসছে। দুটো পেট্রোল পাম্পে নাকি আগুন লাগানো হয়েছে। কয়েকজন মারাও গেছে। শহরভরতি গুজব। শোনা যাচ্ছে এরশাদ সরকারের পতন হয়েছে। তিনি তাঁর প্রিয় গলফ সেট বিক্রি করে দিয়েছেন। একটা হেলিকপ্টার নাকি বঙ্গভবনে রেডি অবস্থায় আছে।

এই অবস্থায় মেয়ে কোলে নিয়ে রাস্তায় নামলাম। মেয়ে একটু পর পর কান্না থামিয়ে জিজ্ঞেস করছে— বাবা, আমি কি মরে যাচ্ছি ?

সাত বছরের মেয়ে এই জাতীয় প্রশ্ন করলে বুক ভেঙে যায়। আমার নিজেরও চোখে পানি এসে গেল।

www.BDeBooks.Com

যখন প্রয়োজন থাকে না তখন মোড়ে মোড়ে ফার্মেসি দেখা যায়। সেইসব ফার্মেসিতে গম্ভীরমুখে ডাক্তার বসে থাকেন। আজ কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। কোনো ফার্মেসি খোলা নেই। দুজন ডাক্তারের বাসায় গেলাম— একজন বাসায় ছিলেন না, অন্যজন মেয়েকে না দেখেই বললেন, মেডিক্যালে নিয়ে যান।

মেডিক্যালেই নিয়ে যেতাম তবু কেন জানি সাইনবোর্ড দেখে দেখে তৃতীয় একজন ডাক্তার খুঁজে বের করলাম। ইনি তিনতলায় থাকেন। সাইনবোর্ডে লেখা স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ। গলায় কাঁটা ফোটা নিশ্চয়ই স্ত্রীরোগ নয়, তবু গেলাম যদি কিছু করতে পারেন।

ডাক্তারের নাম হাসনা বানু। ছোটখাটো মানুষ। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। ভদ্রমহিলার মধ্যে মাতৃভাব অত্যন্ত প্রবল। একদল মানুষ আছে যাদের দেখলেই আপনজন মনে হয়। প্রথম দর্শনেই তাঁকে এরকম মনে হলো। তিনি আমার মেয়েকে চেয়ারে বসিয়ে হাঁ করালেন। গলায় টর্চের আলো ফেলে চিমটা দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে এক ইঞ্চি লম্বা একটা কাঁটা বের করে ফেললেন। অতি কোমল গলায় বললেন, মামণি ব্যথা কমেছে ?

আমার মেয়ে চুপ করে রইল। সে বোধহয় তখনও ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছে না। ডাক্তার হাসনা বানু বললেন, কী মেয়ে, আমার সঙ্গে কথা বলবে না ? আমার মেয়ে হেসে ফেলল।

'এখন বলো তুমি কী খাবে ? আইসক্রিম খাবে ? দিই একটু আইসক্রিম ?'

'ভ্যানিলা আইসক্রিম থাকলে খাব।'

'আমার কেন জানি মনে হচ্ছে ভ্যানিলা আইসক্রিম আছে।'

ভদ্রমহিলার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গেল। আমি তাঁকে চিকিৎসার জন্যে কিছু টাকা দিতে গেলাম, তিনি শান্ত গলায় বললেন, ডাক্তারি যখন করি তখন চিকিৎসার টাকা তো নেবই, কিন্তু তাই বলে বাচ্চা একটা মেয়ের গলার কাঁটা বের করারও ফি দাবি করব এটা কী করে ভাবলেন ? কাঁটাটা বের করার পর আপনার মেয়ের হাসি আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন। এই হাসির দাম লক্ষ টাকা। তা-ই না ?

মিসেস হাসনা বানুর সঙ্গে এই হচ্ছে আমার পরিচয়ের সূত্র। পরিচয় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তিনি নিউক্লিয়ার মেডিসিন গবেষণায় একটি বৃত্তি নিয়ে আমেরিকায় জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাবার পর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

হয়ে যায়। এখন যে গল্পটি বলব সেটি তাঁর কাছ থেকে শোনা। যেভাবে শুনেছি অবিকল সেইভাবে গল্পটি বলার চেষ্টা করছি—

মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করে বেরুবার পরপর আমি একটা ক্লিনিকে চাকরি নিই। এখন যেমন চারদিকে ক্লিনিকের ছড়াছড়ি, তখন তেমন ছিল না। অল্প কয়েকটা ক্লিনিক ছিল— সবই মাতৃসদন। আমি যে ক্লিনিকে চাকরি নিই সেটা সেই সময়ের খুব নামী ক্লিনিক। ধনী পরিবারের মা'রাই শুধু আসতেন। সুযোগ-সুবিধা ভালো ছিল। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিমছাম ক্লিনিক। সর্বসাকুল্যে পনেরোটা বেড ছিল। দশটি 'এ' ক্যাটাগরির, পাঁচটি 'বি' ক্যাটাগরির। 'এ' ক্যাটাগরির ঘরগুলিতে এয়ারকুলার বসানো ছিল। আমরা ডাক্তার ছিলাম তিনজন। প্রধান ডাক্তার মেডিক্যাল কলেজের একজন অধ্যাপক। আমি এবং নাসিমা আমরা দুজন সদ্য পাস করা ডাক্তার। অবিশ্যি সব কাজ আমরা দুজনই দেখতাম। যেহেতু ছোট্ট ক্লিনিক আমাদের কোনো অসুবিধা হতো না। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে আমাদের ক্লিনিকে আঠারো-উনিশ বছরের একটি মেয়ে ভরতি হলো। প্রথম মা হতে যাচ্ছে। ভয়ে অস্থির। আমি প্রাথমিক পরীক্ষা করে দেখলাম এখনও অনেক দেরি। একেকটা কনট্রেকসানের ভেতর গ্যাপ অনেক বেশি। আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম। বললাম, ভয়ের কিছু নেই।

মেয়েটি করুণ গলায় বলল, তুমি তো বাচ্চা মেয়ে। তুমি পারবে ? তুমি জান সবকিছু ?

আমি হেসে ফেললাম। হাসতে হাসতেই বললাম, আমি বাচ্চা নই, তা ছাড়া আমি একজন খুব ভালো ডাক্তার। আপনার কোনো ভয় নেই। আমি ছাড়াও এখানে ডাক্তার আছেন। একজন প্রফেসর আছেন। তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাকে দেখবেন।

রুগিণী বললেন, ভাই তোমাকে তুমি করে বলেছি বলে রাগ করনি তো ?

'না।'

'আমার এমন বদভ্যাস, যাকে পছন্দ হয় তাকেই তুমি বলে ফেলি।'

আমি কাগজপত্র ঠিকঠাক করার জন্য ভদ্রমহিলার স্বামীকে নিয়ে অফিসে চলে এলাম। দেখা গেল খুবই ক্ষমতাবান পরিবারের বউ। সাত-আটটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। হোমড়া-চোমড়া ধরনের কিছু মানুষ বিরক্তমুখে হাঁটাহাঁটি করছে। একজন অতি বিরক্ত গলায় বলছে, আপনাদের ব্যবস্থা তো মোটেই ভালো না। ইমার্জেন্সি হলে পেশেন্টকে আপনারা কী করবেন ? এখানে কি অপারেশন করার ব্যবস্থা আছে ?

www.BDeBooks.Com

'জী আছে।'

'আপনাদের নিজস্ব জেনারেটর আছে ? ধরুন হঠাৎ যদি ইলেকট্রিসিটি চলে যায় তখন ? তখন কী করবেন ? মোমবাতি জ্বালিয়ে তো নিশ্চয়ই অপারেশন হবে না ?'

লোকগুলি আমাদের বিরক্ত করে মারল। দাড়িওয়ালা এক ভদ্রলোক বললেন, আপনাদের এখান থেকে আমরা বেশকিছু টেলিফোন করব। দয়া করে বিরক্ত হবেন না। সব পেমেন্ট করা। মানি উইল নট বি এ প্রবলেম।

রুগিণী ভরতি হয়েছেন বিকেলে, রাত ন'টা বাজার আগেই স্রোতের মতো মানুষ আসতে লাগল। অনেকের হাতে ফুলের গুচ্ছ, অনেকের হাতে উপহারের প্যাকেট। বিশ্রী অবস্থা।

আমি সহজে ধৈর্য হারাই না। আমারও শেষ পর্যন্ত মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। আমি বললাম, আপনারা কী শুরু করেছেন ? এটাকে একটা বাজার বানিয়ে ফেলেছেন। দয়া করে ভিড় পাতলা করুন। একজন শুধু থাকুন। ডেলিভারি হোক তখন আসবেন।

আমার কথায় একজন ভদ্রমহিলা, সম্ভবত মেয়ের শাশুড়ি হবেন— চোখ-মুখ লাল করে বললেন, আপনি কি জানেন এই মেয়ে কোন বাড়ির বউ ?

আমি বললাম, আমি জানি না। আমি জানতেও চাই না। সে আমার পেশেন্ট এইটুকু শুধু জানি। আর দশটা পেশেন্টকে আমি যেভাবে দেখব তাকেও একইভাবে দেখা হবে।

'আর দশটা বউ এবং আমার ঘরের বউ এক ?'

'আমার কাছে এক।'

'জান, আমি এই মুহূর্তে তোমার চাকরি খেতে পারি।'

আমি শীতল গলায় বললাম, আপনি আমার চাকরি খেতে পারেন না। চিকিৎসক হিসেবে আমার কোনো ব্যর্থতা পাওয়া গেলে তবেই চাকরি যেতে পারে, তার আগে নয়। আপনি শুধু-শুধুই চ্যাঁচামেচি করছেন।

ভদ্রমহিলা রেগে গিয়ে স্কাউনড্রেল, লোফার এইসব বলতে লাগলেন। একজন ভদ্রমহিলা এমন কুৎসিত ভাষায় কথা বলতে পারেন আমার জানা ছিল না। বিরাট হইচই বেধে গেল। আমাদের প্রফেসর এলেন। ভেবেছিলাম তিনি আমার পক্ষে কথা বলবেন। তা বললেন না। আমার ওপর অসম্ভব রেগে গেলেন। আমাকে অবাক করে দিয়ে সবার সামনে উঁচু গলায় বললেন— হাসনা, তোমাকে এখানে চাকরি করতে হবে না। ইউ ক্যান লিভ।

আমি আমার নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। আমার প্রফেসর জানেন কত আগ্রহ, কত যত্ন নিয়ে আমি এখানে কাজ করি; অথচ তিনি...

আমি রিকশা নিয়ে বাসায় চলে এলাম। সহজে আমার চোখে পানি আসে না। কিন্তু রিকশায় ফিরবার পথে খুব কাঁদলাম। তখন বয়স অল্প। মন ছিল খুব স্পর্শকাতর।

রাত এগারোটায় প্রফেসর আমাকে নিতে এলেন। করুণ গলায় বললেন, হাসনা খুব কেলেঙ্কারি হয়ে গেছে। তুমি চলে আসার পর ক্লিনিকের কেউ কোনো কাজ করছে না। অসহযোগ আন্দোলন। এরকম যে দাঁড়াবে কল্পনাও করিনি। এখন তুমি চলো।

আমি বললাম, স্যার আমার যাবার প্রশ্নই ওঠে না। আপনি রুগীর আত্মীয়দের বলুন তাকে অন্য কোনো ক্লিনিকে নিয়ে যেতে।

'বলেছিলাম। পেশেন্ট যাবে না। সে এইখানেই থাকবে।'

'এইখানেই থাকবে ?'

'হ্যাঁ, এইখানেই থাকবে। এবং সে বলে দিয়েছে ডেলিভারির সময় তুমি ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকতে পারবে না। এখন তুমি যদি না যাও আমার খুব মুশকিল হবে। আমি খুব বিপদে পড়ব। তুমি তো বাইরের জগতের কোনো খোঁজখবর রাখ না। যদি রাখতে তা হলে বুঝতে এই মেয়ে কোন পরিবারের মেয়ে। বাংলাদেশের মতো দেশে এরা যা ইচ্ছা করতে পারে। তুমি চলো।'

'স্যার, আমি যাব না। ওরা যা ইচ্ছা করুক।'

'হাসনা, অন্য সবকিছু বাদ দাও। তুমি পেশেন্টের দিকে তাকাও। সে তোমার ওপর নির্ভর করে আছে। আমার ওপর তোমার রাগটা বড়, না পেশেন্টের প্রতি তোমার দায়িত্ব বড় ?

আমি শালগায়ে বের হয়ে এলাম। ক্লিনিকে তখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। ওয়েটিংরুমে তিনজন শুধু বসে আছেন। রুগিণীর কাছে দুজন— একজন রুগিণীর শাশুড়ি। তিনি আমাকে দেখেই শীতল গলায় বললেন, রাগের মাথায় কী বলেছি কিছু মনে রেখো না মা। রাগ উঠলে আমার মাথা ঠিক থাকে না।

আমি বললাম, আমি কিছু মনে রাখিনি।

'বউমা তখন থেকে বলছিল, সে তোমাকে যেন কী বলতে চায়। তুমি ওর কথাটা শোনো। ও খুব ভয় পেয়েছে।'

www.BDeBooks.Com

আমি মেয়েটির পাশে এসে দাঁড়ালাম।

মেয়েটি ক্ষীণ স্বরে বলল, আপনারা ঘর থেকে যান মা। আমি ওর সঙ্গে একা কথা বলব। আর কেউ যেন না থাকে।

ভদ্রমহিলা দুজন নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে ঘর ছেড়ে গেলেন। মেয়েটা বলল, ভাই তুমি দরজাটা বন্ধ করে দাও।

'তার কি দরকার আছে ?'

'আছে। তুমি লক করো। তোমার সঙ্গে আমার খুব জরুরি কথা, দরজা বন্ধ করে তুমি আমার পাশে এসে বসো।'

আমি তা-ই করলাম। কনট্রেকশানের সময় কমে এসেছে। ব্যথার ধকল সামলাতে মেয়েটির খুবই কষ্ট হচ্ছে। তার গলার স্বর পালটে গেছে। মনে হচ্ছে সে অনেকদূর থেকে কথা বলছে। সে আমার হাত ধরে বলল, ভাই তোমার কি রাগ কমেছে ?

'হ্যাঁ কমেছে।'

'তুমি আমার গায়ে হাত দিয়ে বলো যে তোমার রাগ কমেছে।'

আমি তার কপালে হাত রেখে বললাম, আমার রাগ কমেছে।

'আমি তোমাকে তুমি তুমি করে বলছি বলে রাগ করছ না তো ? তুমি নিশ্চয়ই বয়সে আমার বড়।'

'আমি মোটেই রাগ করিনি।'

'আমি সবাইকেই তুমি তুমি বলি না। যাদের আমার খুব প্রিয় মনে হয়, খুব আপন মনে হয় তাদের আমি তুমি বলি। তোমাকে প্রথম দেখেই আমার ভালো লেগেছে। তুমিও কিন্তু আমাকে তুমি বলবে।'

'কথা বলতে তোমার কষ্ট হচ্ছে, তুমি বরং চুপ করে থাকো। বড় বড় করে নিশ্বাস নাও। আমার মনে হয় তোমার প্লাসেন্টা ভাঙতে শুরু করেছে।'

'আর কত দেরি ?'

'এখনও দেরি আছে। রাত তিনটার আগে কিছু হবে না। রাত তিনটা পর্যন্ত তোমাকে কষ্ট করতে হবে।'

'এখন ক'টা বাজে ?'

'বারোটা একুশ।'

'মনে হচ্ছে ঘড়ি চলছেই না।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। কিছু রুটিনকাজ আছে। এগুলি সারতে হবে। নরম্যাল ডেলিভারির জন্য বাচ্চার পজিশন ঠিক আছে। তবু ইমার্জেন্সির জন্যে তৈরি থাকা ভালো।

মেয়েটি বলল, যেজন্যে তোমাকে বসিয়েছিলাম তা এখনও বলিনি। তুমি বসো। উঠে দাঁড়ালে কেন ? আসল কথা তো বলিনি।

আমি বসলাম।

মেয়েটি ফিসফিস করে বলল, ওরা আমার বাচ্চাটাকে মেরে ফেলবে।

আমি চমকে উঠলাম। এই মেয়ে এসব কী বলছে, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আবোল-তাবোল বকছে না তো ?

'আমি জানি ওরা আমার বাচ্চাটাকে মেরে ফেলবে।'

'কারা ?'

'আমার শ্বশুরবাড়ির লোকরা। ডাক্তার, নার্স সবাইকে টাকা দিয়ে কিনে ফেলেছে। তোমাকেও কিনবে। তারপর বাচ্চাটাকে মারবে।'

'তুমি এসব কী বলছ ?'

'যা সত্যি আমি তা-ই বলছি।'

'ওরা বাচ্চাকে মারবে কেন ?'

মেয়েটি জবাব দিল না। ব্যথার প্রবল ঝাপটা সামলাবার চেষ্টা করল। আমি তাকে সময় দিলাম। আমার মনে হলো মেয়েটা সম্ভবত পুরোপুরি সুস্থ নয়। হয়তো কিছু অস্বাভাবিকতা তার মধ্যে আছে।

'তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না। তাই না ?'

'না।'

'যা সত্যি তা আমি বললাম।'

'তুমি জানলে কী করে ওরা বাচ্চাটাকে মেরে ফেলতে চায় ?'

'আমাকে বলেছে।'

'কে বলেছে ?'

'আমার বাচ্চাটা আমাকে বলেছে।'

আমি পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হলাম মেয়েটার মাথা খারাপ। সম্ভবত সে পারিবারিক জীবনে খুব অসুখী। শ্বশুরবাড়ির কাউকে তার পছন্দ না। সবাইকেই সে শত্রুপক্ষ ধরে নিয়েছে। মেয়েটি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'তুমি আমার কথা এক বর্ণও বিশ্বাস করনি, তাই না ?'

'তুমি ঠিকই ধরেছ। বিশ্বাস করার কথা না। তোমার বাচ্চা তোমাকে কী করে বলবে।

'ও আমাকে স্বপ্নে বলেছে। একবার না, অসংখ্যবার বলেছে।'

www.BDeBooks.Com

'স্বপ্নে বলেছে ?'

'হ্যাঁ স্বপ্নে। গতকাল শেষরাতেও স্বপ্নে দেখেছি।

'কী দেখেছ ?'

'দেখলাম আমার বাচ্চাটা আমাকে বলছে— মা সবাই মিলে আমাকে মেরে ফেলবে। সবাই যুক্তি করে আমাকে মারবে। মা, আমি কী করি ?'

বলতে বলতে মেয়েটি থরথর করে কাঁপতে লাগল।

আমি তাকে বললাম, প্রথমবার যেসব মেয়ে কনসিভ করে তাদের প্রায় সবাই ভয়ংকর সব স্বপ্ন দেখে। যেমন— তারা মারা যাচ্ছে, মৃত বাচ্চা হচ্ছে— এইসব। এর কোনো মানে নেই। মেয়েরা সেই সময় খুব আতঙ্কগ্রস্ত থাকে বলেই এরকম স্বপ্ন দেখে।

'আমি জানি আমি যা স্বপ্নে দেখেছি তা-ই হবে, আমার স্বপ্ন অন্য মেয়েদের স্বপ্নের মতো নয়। সবাই যুক্তি করে আমার ছেলেটাকে মারবে।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'তোমার কোলে যখন ফুটফুটে একটা বাচ্চা দিয়ে দেব, তখন তুমি বুঝবে যে কত বড় মিথ্যা সন্দেহ তোমার মধ্যে ছিল।'

মেয়েটার চোখ চিকচিক করতে লাগল। সে গাঢ় স্বরে বলল, সত্যি তুমি তা-ই করবে ?

'অবশ্যই!'

'তাহলে তুমি প্রতিজ্ঞা করো। কোরান শরিফ ছুঁয়ে বলো তুমি বাচ্চাটাকে মারবে না। ওরা যখন মারতে চাইবে তুমি মারতে দেবে না। তুমি ফেরাবে।'

'একটা শিশুকে আমি খুন করব এটা তুমি বলছ ?'

'তুমি কোরান শরিফ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করো।'

'প্রতিজ্ঞার কোনো দরকার নেই।'

'দরকার থাকুক বা না-থাকুক তুমি প্রতিজ্ঞা করো।'

'কোরান শরিফ এখানে পাব কোথায় ?'

'আমার সঙ্গে আছে। আমার ঐ কালো ব্যাগটার ভেতর। আমি নিয়ে এসেছি।'

রুগীকে শান্ত করার জন্যেই প্রতিজ্ঞা করতে হলো। রুগী শান্ত হলো না। তার অস্থিরতা আরো বেড়ে গেল। সে চাপাগলায় বলল, আমি জানি

তুমি প্রতিজ্ঞা রাখতে পারবে না। যদি না রাখ তাহলে আমার অভিশাপ লাগবে। আমি তোমাকে একটা কঠিন অভিশাপ দিচ্ছি।

মেয়েটি সত্যি সত্যি একটা কঠিন অভিশাপ দিয়ে বসল। মেয়েটার মাথার যে ঠিক নেই, সে যে অসুস্থ একটি মেয়ে তার আরেকটি প্রমাণ পেলাম। তবে তার এই অসুস্থতা, এই মানসিক যন্ত্রণা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। একটি হাসিখুশি শিশু তার সমস্ত কষ্ট ভুলিয়ে দেবে।

সবকিছুই ঠিকঠাকমতো চলছিল।

রাত দুটায় বাইরের দুজন পুরুষ-ডাক্তার এলেন। ডেলিভারির সময় এঁরা থাকবেন। এঁদের মধ্যে একজন আমার পরিচিত। ডাক্তার সেন। বড় ডাক্তার এবং ভালো ডাক্তার।

আমাদের রুগিণী নতুন ডাক্তার দুজন দেখেই আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আমার হাত ধরে ফিসফিস করে বলল, এরা কারা ? এরা আমার বাচ্চাকে খুন করবে।

আমি বললাম, তুমি নিশ্চিত থাকো— আমি সারাক্ষণ এখানে থাকব। এক সেকেন্ডের জন্যে নড়ব না। তাছাড়া ডাক্তার সেনকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। তাঁর মতো ডাক্তার কম আছে।

'মনে থাকে যেন তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ।'

'আমার মনে আছে।'

'প্রতিজ্ঞা ভাঙলে আমার অভিশাপ লাগবে।'

'আমার মনে আছে।'

তার কিছুক্ষণ পরই ভদ্রমহিলার স্বামী আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। খুবই অল্প বয়স্ক একজন যুবক। তাঁকে বেশ ভদ্র ও বিনয়ী মনে হলো। তবে যে কোনো কারণেই হোক তাঁকে বেশ ভীত বলে মনে হচ্ছিল। ভদ্রলোক নরম স্বরে বললেন, আপা, আমার স্ত্রী সম্ভবত আপনাকে কিছু বলেছে। আপনি ওর কথায় কিছু মনে করবেন না। ও এসব কেন যে বলছে কিছু বুঝতে পারছি না। আমাদের বাচ্চাটা সংসারের প্রথম সন্তান। আমি আমাদের পরিবারের বড় ছেলে। অথচ ওর ধারণা...

আমি ভদ্রলোককে আশ্বস্ত করার জন্যে বললাম, আপনি এসব নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাবেন না।

'সব ঠিকঠাক আছে তো আপা ?'

www.BDeBooks.Com

'সব ঠিক আছে।'

'সিজারিয়ান লাগবে না ?'

'না— নরম্যাল ডেলিভারি হবে। তাছাড়া ডাক্তার সেন এসেছেন। উনি খুবই বড় ডাক্তার এবং হাইলি স্কিলড।'

'তাহলে আপনি বলছেন সব ঠিকঠাক হবে ?'

'হ্যাঁ।'

রাত তিনটার পর থেকে দেখা গেল সব কেমন বেঠিক চলছে। বাচ্চা নেমে এসেছে বার্থ চ্যানেলের মুখে। এই সময় ডাক্তার সেন বললেন, বাচ্চার পজিশন তো ঠিক নেই। মাথা উপরের দিকে। এতক্ষণ তোমরা কী মনিটর করেছ ?

আমিও দেখলাম— তাই। এরকম হওয়ার কথা নয়। কিছুক্ষণ আগেই সব পরীক্ষা করা হয়েছে। আমরা মুখ-চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম। প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে লাগল। এই সময় এত রক্তপাতের কারণই নেই। টকটকে লাল রঙের রক্ত যা ধমনি থেকে আসছে। সমস্যাটা কোথায় ?

ব্লাড ক্রস ম্যাচিং করা ছিল— রক্ত দেয়া শুরু হলো, কিন্তু এটা সমস্যার কোনো সমাধান নয়। মনে হলো রুগিণী বাইরের রক্ত ঠিক গ্রহণ করতে পারছে না।

ডাক্তার সেন গম্ভীর গলায় বললেন, সামথিং ইজ ভেরি রং।

আমাদের সবার গা দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। ডাক্তার এসব কী বলছেন!

কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বিতীয় সমস্যা দেখা দিল– হঠাৎ করে কনট্রেকশান বন্ধ হয়ে গেল। অথচ এই সময়ই কনট্রেকশান সবচে বেশি প্রয়োজন। শিশুটি কি বার্থ চ্যানেলে মারা গেছে ?

রুগিণী ফিসফিস করে বলল, আমার ঘুম পাচ্ছে। ঘুমে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।

ডাক্তার সেন ফোরসেপ ডেলিভারির প্রস্তুতি নিলেন আর তখন ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। আজকাল বাতি চলে গেলেই ইমার্জেন্সি বাতি জ্বলে ওঠে, তখনকার অবস্থা তা ছিল না। তবে আমাদের কাছে টর্চ, হ্যাজাক, মোমবাতি সবসময় থাকে। সমস্যার সময় ইলেকট্রিসিটি চলে যাওয়া কোনো নতুন ঘটনা নয়— কাজেই প্রস্তুতি থাকবেই। দ্রুত হ্যাজাক জ্বালানো হলো।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরিশ্রম করে ডাক্তার সেন ডেলিভারি করালেন— যে জিনিসটি বেরিয়ে এল, আমরা চোখ বড় বড় করে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

কুৎসিত কদাকার একটা কিছু যার দিকে তাকানো যায় না। এ আর যা-ই হোক, মানবশিশু নয়। চেনাজানা পৃথিবীর সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। ঘন কৃষ্ণবর্ণের একতাল মাংসপিণ্ড। এর থেকে হাতির শুঁড়ের মতো আট-দশটি শুঁড় বেরিয়ে এসেছে। শুঁড়গুলি বড় হচ্ছে এবং ছোট হচ্ছে। তালে তালে মাংসপিণ্ডটিও বড়ছোট হচ্ছে। মানবশিশুর সঙ্গে এর একটিমাত্র মিল— এই জিনিসটিরও দুটি বড় বড় চোখ আছে। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে দেখছে চারদিকের পৃথিবীকে। চোখ দুটি সুন্দর। কাজলটানা।

ডাক্তার সেন হতভম্ব গলায় বললেন, হোয়াট ইজ দিস ? হোয়াই ইজ দিস ? ফোরসেপ দিয়ে ধরা জন্তুটাকে তিনি মাটিতে ফেলে দিলেন। মেঝেতে সে কিলবিল করতে লাগল। মনে হচ্ছে শুঁড়গুলিকে পায়ের মতো ব্যবহার করে সে এগুতে চাচ্ছে। আমার সঙ্গের সহকর্মী হঠাৎ পেটে হাত দিয়ে বমি করতে শুরু করল।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে রুগিণীর জ্ঞান নেই। জ্ঞান থাকলে এই ভয়াবহ দৃশ্য তাকে দেখতে হতো।

ডাক্তার সেন বললেন– কিল ইট। এক্ষুনি এটাকে মেরে ফেলা দরকার।

জন্তুটি কি মানুষের কথা বুঝতে পারে ? ডাক্তার সেনের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র ও তীক্ষ্ণ শব্দ বের হয়ে এল। অত্যন্ত হাই ফ্রিকোয়েন্সি সাউন্ড— যা মানুষের স্নায়ুকে প্রচণ্ড ঝাঁকিয়ে দেয়।

ডাক্তার সেন বললেন— অপেক্ষা করছেন কেন ? কিল ইট।

জন্তুটি এগুতে শুরু করেছে। শুঁড়গুলি বড় হচ্ছে, ছোট হচ্ছে আর সে এগুচ্ছে তার মা'র দিকে। আমরা দেখছি সে মেঝে বেয়ে তার মা'র খাটের দিকে যাচ্ছে। খাট বেয়ে উপরে উঠছে। আশ্রয় খুঁজছে মা'র কাছে। যেন সে জেনে গেছে এই অকরুণ পৃথিবীতে একজনই শুধু তাকে পরিত্যাগ করবে না।

ডাক্তার সেন বললেন, আপনারা অপেক্ষা করছেন কেন ? কিল ইট।

আবার আগের মতো শব্দ হলো। জন্তুটি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডাক্তার সেনের দিকে। তার চোখ দুটি মানুষের চোখ। সেই চোখের ভাষা আমরা জানি। সেই চোখ করুণা এবং দয়া ভিক্ষা করছে। কিন্তু করুণা সে আমাদের কাছ থেকে পাবে না। আমরা মানুষ, আমরা আমাদের মাঝে

www.BDeBooks.Com

তাকে গ্রহণ করব না। এই ভয়ংকর অসুন্দর ও কুৎসিতকে আমরা আশ্রয় দেব না। সে পশু হয়ে এলে ভিন্ন কথা ছিল। সে পশু হয়ে আসেনি। মানুষের সিঁড়ি বেয়ে এসেছে।

ডাক্তার সেন বললেন, এই জন্তুটিকে যে মেরে ফেলতে হবে এ বিষয়ে কি আপনাদের কারো মনে কোনো দ্বিধা আছে ?

আমরা সবাই বললাম— না, আমাদের মধ্যে কোনো দ্বিধা নেই।

ডাক্তার সেন বললেন, আপনারা কি মনে করেন এই জন্তুটি হত্যার আগে তার আত্মীয়স্বজনদের মত নেয়া উচিত ?

আমরা বললাম— না, আমরা তাও মনে করি না।

যে লোহার দণ্ডটি থেকে স্যালাইন ওয়াটারের ব্যাগ ঝুলছিল আমি তা খুলে হাতে নিলাম। জন্তুটি এখন তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কী সুন্দর বড় বড় শান্ত চোখ! কী আছে ঐ চোখে ? ঘৃণা, দুঃখ, হতাশা ? জন্তুটা খাটের পা বেয়ে অর্ধেক উঠে গিয়েছিল। সেখানেই সে থেমে গেল। বোধহয় বুঝতে পেরেছে আর উঠে লাভ নেই।

প্রথম আঘাতটি করলাম আমি।

সে অবিকল মানুষের মতো গলায় ডাকল— মা, মা।

তার মা সাড়া দিল না।

আমার হাত থেকে লোহার রডটি পড়ে গিয়েছিল। ডাক্তার সেন তা কুড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। হত্যাকাণ্ডে বেশি সময় লাগল না।

ডাক্তার হাসনা বানুকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম— এই ঘটনার কী কোনো ব্যাখ্যা আপনি দাঁড় করাতে পারেন ?

ডাক্তার হাসনা ক্লান্ত গলায় বলেছিলেন— আমার কাছে কোনো ব্যাখ্যা নেই, তবে এই ঘটনার প্রায় সাত বছর পর আমেরিকান জার্নাল অব মেডিক্যাল সোসাইটিতে এরকম একটি শিশুর জন্মবৃত্তান্তের কথা পাই। শিশুটির জন্ম হয়েছিল বলিভিয়ার এক গ্রামে। শিশুটির বর্ণনার সঙ্গে আমাদের জন্তুটির বর্ণনা হুবহু মিলে যায়। ঐ শিশুটিকেও জন্মের কুড়ি মিনিটের মাথায় হত্যা করা হয় এবং রিপোর্ট অনুসারে সেও মৃত্যুর আগে ব্যাকুল হয়ে বলিভিয়ান ভাষায় মা'কে কয়েকবার ডাকে।

'আপনার কাছে কোনো ব্যাখ্যা নেই ?'

'না। তবে আমার একটা হাইপোথিসিস আছে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, প্রকৃতি ইভোলিউশন প্রক্রিয়ায় হয়তো নতুন কোনো প্রাণ সৃষ্টির

কথা ভাবছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। আমরা প্রাণপণে সেই প্রক্রিয়াকে বাধা দিচ্ছি।'

'আপনার ধারণা এরকম ঘটনা আরো ঘটবে ?'

'হ্যাঁ। প্রকৃতি সহজে হাল ছাড়ে না। সে চেষ্টা চালিয়ে যাবে এবং সে লক্ষ রাখবে যাতে ভবিষ্যতে আমরা বাধা দিতে না পারি। ঐ যে মা আগে স্বপ্ন দেখলেন— তার একটিই ব্যাখ্যা— প্রকৃতি শিশুটি রক্ষার চেষ্টা করছে। এ ধরনের প্রোটেকশান দেবার চেষ্টা করছে। এখন সে পারছে না। তবে ভবিষ্যতে সে নিশ্চয়ই আরো কোনো ভালো প্রোটেকশানের ব্যবস্থা করবে।'

'আপনি কি আপনার হাইপোথিসিস বিশ্বাস করেন ?'

ডাক্তার হাসনা বানু জবাব দিলেন না। তাঁর কাছে এই প্রশ্নের জবাব নেই। জবাব থাকার কথাও নয়। কিছু কিছু সময় আসে যখন আমরা বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের সীমারেখায় বাস করি। তখন একই সঙ্গে আমরা দেখতে পাই এবং দেখতে পাই না। বুঝতে পারি এবং বুঝতে পারি না। অনুভব করি এবং অনুভব করি না। সে বড় রহস্যময় সময়।

www.BDeBooks.Com

দ্বিতীয়জন

প্রিয়াংকার খুব খারাপ ধরনের একটা অসুখ হয়েছে।

অসুখটা এমন যে কাউকে বলা যাচ্ছে না। বললে কেউ বিশ্বাস করবে না, কিংবা বিশ্বাস করার ভান করে আড়ালে হাসাহাসি করবে। একজনকে অবিশ্যি বলা যায়— জাভেদকে। জাভেদ তার স্বামী। স্বামীর কাছে কিছু গোপন থাকা উচিত নয়। অসুখবিসুখের খবর সবার আগে স্বামীকেই বলা দরকার।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে জাভেদের সঙ্গে প্রিয়াংকার পরিচয় এখনও তেমন গাঢ় হয়নি। হবার কথাও নয়। তাদের বিয়ে হয়েছে একুশ দিন আগে। এখনও প্রিয়াংকার তুমি বলা রপ্ত হয়নি। মুখ ফসকে আপনি বলে ফেলে। এরকম গম্ভীর, বয়স্ক একজন মানুষকে তুমি বলাও অবিশ্যি খুব সহজ নয়। মুখে কেমন বাধোবাধো ঠেকে। প্রিয়াংকা চেষ্টা করে আপনি তুমি কোনটাই না বলে চালাতে। যেমন— 'তুমি চা খাবে ?' না বলে সে বলে— চা দেব ? এইভাবে দীর্ঘ আলাপ চালানো যায় না, তার চেয়েও বড় কথা মানুষটা খুব বুদ্ধিমান। ভাববাচ্যে কিছুক্ষণ কথা বলার পরই সে হাসিমুখে বলে, তুমি বলতে কষ্ট হচ্ছে, তাই না ?

তুমি বলতে কষ্ট হওয়াটা দোষের কিছু না। প্রিয়াংকার বয়স মাত্র সতেরো। তাও পুরোপুরি সতেরো হয়নি। জুন মাসে হবে। এখনও দুমাস বাকি। আর ঐ মানুষটার বয়স খুব কম ধরলেও ত্রিশ। তার বয়সের প্রায় দ্বিগুণ। সারাক্ষণ গম্ভীর থাকে বলে বয়স আরো বেশি দেখায়। বরের বয়স বেশি বলে প্রিয়াংকার মনে কোনো ক্ষোভ নেই। বরদের চ্যাংড়া চ্যাংড়া

দেখালে ভালো লাগে না। তাছাড়া মানুষটা অত্যন্ত ভালো। ভালো এবং বুদ্ধিমান। কমবয়েসী বোকা বরের চেয়ে বুদ্ধিমান বয়স্ক বর ভালো।

বিয়ের রাতে নানান কিছু ভেবে প্রিয়াংকা আতঙ্কে অস্থির হয়েছিল। ধক ধক করে বুক কাঁপছিল। কপাল রীতিমতো ঘামছিল। মানুষটা সঙ্গে সঙ্গে তা বুঝে ফেলেছিল। কাছে এসে ভারী গলায় বলল, ভয় করছে ? ভয়ের কী আছে বলো তো ?

প্রিয়াংকার বুকের ধকধকানি আরো বেড়ে গেল। সে হাঁ না কিছুই বলল না। একবার মনে হলো সে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। মানুষটা তখন নরম গলায় বলল, ভয়ের কিছু নেই। ঘুমিয়ে পড়ো। বলেই প্রিয়াংকার গায়ে চাদর টেনে দিল। তার গলার স্বরে কিছু একটা ছিল। প্রিয়াংকার ভয় পুরোপুরি কেটে গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। অনেক রাতে একবার ঘুম ভেঙে দেখে লোকটি অন্যপাশ ফিরে ঘুমুচ্ছে। খানিকক্ষণ জেগে থেকে প্রিয়াংকা আবার ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়, লোকটি তখন পাশে নেই।

একটা মানুষকে চেনার জন্যে একুশ দিন খুব দীর্ঘ সময় নয়। তবু প্রিয়াংকার ধারণা মানুষটা ভালো। বেশ ভালো। এরকম একজন মানুষকে তার অসুখের কথাটা অবশ্যই বলা যায়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে অসুখটার সঙ্গে এই মানুষটার সম্পর্ক আছে। এই কারণেই তাকে বলা যাবে না। কিন্তু কাউকে বলা দরকার। খুব তাড়াতাড়ি বলা দরকার। নয়তো সে পাগল হয়ে যাবে। কিছুটা পাগল সে বোধহয় হয়েই গেছে। সারাক্ষণ অস্থির লাগে। সন্ধ্যা মেলাবার পর শরীর কাঁপতে থাকে। তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকে। গ্লাসের পর গ্লাস পানি খেলেও তৃষ্ণা মেটে না। সামান্য শব্দে ভয়ংকর চমকে ওঠে। সেদিন বাতাসে জানালার কবাট নড়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে অস্থির হয়ে গোঙানির মতো শব্দ করল প্রিয়াংকা। হাতের চায়ের কাপ থেকে সবটা চা ছলকে পড়ল শাড়িতে। ভাগ্যিস আশপাশে কেউ ছিল না। কেউ থাকলে নিশ্চয়ই খুব অবাক হতো। প্রিয়াংকার ছোট মামা যেমন অবাক হলেন।

তিনি প্রিয়াংকাকে দেখতে এসেছিলেন। তার দিকে তাকিয়েই বিস্মিত গলায় বললেন, তোর কী হয়েছে রে ? প্রিয়াংকা হালকা গলায় বলল, কিছু হয়নি তো! তুমি কেমন আছ মামা ?

'আমার কথা বাদ দে, তোকে এমন লাগছে কেন ?'

'কেমন লাগছে ?'

www.BDeBooks.Com

'চোখের নিচে কালি পড়েছে। মুখ শুকনো। কী ব্যাপার ?'

'কোনো ব্যাপার না মামা।'

'গালটাল ভেঙে কী অবস্থা। তুই কথাও তো কেমন অন্যরকমভাবে বলছিস।'

'কীরকমভাবে বলছি ?'

'মনে হচ্ছে তোর গলাটা ভাঙা।'

'ঠাণ্ডা লেগেছে মামা।'

প্রিয়াংকা কয়েকবার কাশল। মামাকে বোঝাতে চাইল যে তার সত্যি সত্যি কাশি হয়েছে, অন্যকিছু না। মামা আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন। শীতল গলায় বললেন, আর কিছু না তো ?

'না।'

'ঠিক করে বল।'

'ঠিক করেই বলছি।'

প্রিয়াংকার কথায় তার মামা খুব আশ্বস্ত হলেন বলে মনে হলো না। সারাক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন। চায়ের কাপে দুটা চুমুক দিয়েই রেখে দিলেন। 'যাইরে মা' বলেই কোনোদিকে না তাকিয়ে হনহন করে চলে গেলেন। মামা চলে যাবার এক ঘণ্টার ভেতরই মামি এসে হাজির। বোঝাই যাচ্ছে মামা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

মামি প্রিয়াংকাকে দেখে আঁতকে উঠলেন। প্রায় চেঁচিয়ে বললেন, এক সপ্তাহ আগে তোকে কী দেখেছি আর এখন কী দেখছি ? কী ব্যাপার তুই খোলাখুলি বল তো। কী সমস্যা ?

প্রিয়াংকা শুকনো হাসি হেসে বলল, কোনো সমস্যা না।

মামি কঠিন গলায় বললেন, তুই বলতে না চাইলে আমি কিন্তু জামাইকে জিজ্ঞেস করব। জামাই আসবে কখন ?

'ও আসবে রাত আটটার দিকে। ওকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না মামি। আমিই বলছি।'

'বল, কিছু লুকোবি না।'

প্রিয়াংকা প্রায় ফিসফিস করে বলল, আমি ভয় পাই মামি।

'কিসের ভয় ?'

'কী যেন দেখি। নিজেও ঠিক জানি না কী দেখি।'

'ভাসাভাসা কথা বলবি না। পরিষ্কার করে বল কী দেখিস।'

প্রিয়াংকা এক পর্যায়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, মামি আমি বোধহয় পাগল হয়ে গেছি। আমি কীসব যেন দেখি।

সে কী দেখে তা তিনি অনেক প্রশ্ন করেও বের করতে পারলেন না। প্রিয়াংকা অন্যসব প্রশ্নের জবাব দেয় কিন্তু কী দেখে তা বলে না। এড়িয়ে যায় বা কাঁদতে শুরু করে।

'তোর কি বর পছন্দ হয়েছে ?'

'হ্যাঁ।'

'সে কি তোকে ভয়-টয় দেখায় ?'

'কী যে তুমি বল মামি, আমাকে ভয় দেখাবে কেন ?'

'রাতে কি তোরা একসঙ্গে ঘুমাস ?'

প্রিয়াংকা লজ্জায় বেগুনি হয়ে গিয়ে বলল, হ্যাঁ।

'সে কি তোকে অনেক রাত পর্যন্ত জাগিয়ে রাখে ?'

'কীসব প্রশ্ন তুমি কর মামি!'

'আমি যা বলছি তার জবাব দে।'

'না, জাগিয়ে রাখে না।'

মামি অনেকক্ষণ থাকলেন। প্রিয়াংকাদের ফ্ল্যাটে ঘুরে ঘুরে দেখলেন। কাজের মেয়ে এবং কাজের ছেলেটির সঙ্গে কথা বললেন। কাজের মেয়েটির নাম মরিয়ম। দেশ খুলনা। ঘরের যাবতীয় কাজ সে-ই করে। কাজের ছেলেটির নাম জিতু মিয়া। তার বয়স নয়-দশ। এদের দুজনের কাছ থেকেও খবর বার করার চেষ্টা করা হলো।

'আচ্ছা মরিয়ম, তুমি কি ভয়-টয় পাও ?'

'না। ভয় পামু ক্যা ?'

'রাতে কিছু দেখ-টেখ না ?'

'কী দেখমু ?'

'আচ্ছা ঠিক আছে— যাও।'

প্রিয়াংকার মামি কোনো রহস্য ভেদ করতে পারলেন না। তাঁর খুব ইচ্ছা ছিল জাভেদের সঙ্গে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করবেন, পরামর্শ করবেন। প্রিয়াংকার জন্যে পারা গেল না। সে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, মামি তুমি যদি তাকে কিছু বল তাহলে আমি কিন্তু বিষ খাব। আল্লাহর কসম বিষ খাব। নয়তো ছাদ থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ব।

www.BDeBooks.Com

তিনি কিছু জিজ্ঞেস করলেন না কারণ প্রিয়াংকা সত্যি বিষ-টিষ খেয়ে ফেলতে পারে। 'আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়' এই কথা লিখে একবার সে এক বোতল ডেটল খেয়ে ফেলেছিল। অনেক ডাক্তার হাসপাতাল করতে হয়েছে। এই কাণ্ড সে করেছিল অতি তুচ্ছ কারণে। তার এক বান্ধবীর সঙ্গে ঝগড়া করে। এই মেয়ের পক্ষে সবই সম্ভব। তাকে কিছুতেই ঘাঁটানো উচিত নয়।

জাভেদ এল রাত সাড়ে আটটার দিকে। জাভেদের সঙ্গে খানিকক্ষণ টুকটাক গল্প করে প্রিয়াংকার মামি ফিরে গেলেন। তাঁর মনের মেঘ কাটল না। হলো কী প্রিয়াংকার ? সে কী দেখে ?

প্রিয়াংকা নিজে জানে না তার কী হয়েছে। মামি চলে যাবার পর তার বুক ধকধক করা শুরু হয়েছে। অল্প অল্প ঘাম হচ্ছে। অসম্ভব গরম লাগছে। কিছুক্ষণ পরপর মনে হচ্ছে বোধহয় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

তারা খাওয়াদাওয়া করে রাত সাড়ে দশটার দিকে ঘুমুতে গেল। জাভেদ বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ে। আজ তা-ই হলো। জাভেদ ঘুমুচ্ছে। তালে তালে বিশ্বাস পড়ছে। জেগে আছে প্রিয়াংকা। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার পানির পিপাসা পেল। প্রচণ্ড পানির পিপাসা। পানি খাবার জন্যে বিছানা ছেড়ে নামতে হবে। যেতে হবে পাশের ঘরে কিন্তু তা সে করবে না। অসম্ভব। কিছুতেই না। পানির তৃষ্ণায় মরে গেলেও না। এই পানি খেতে গিয়েই প্রথমবার তার অসুখ ধরা পড়েছিল। ভয়ে ঐদিনই সে মরে যেত। কেন মরল না ? মরে গেলেই ভালো হতো। তার মতো ভীতু মেয়ের মরে যাওয়াই উচিত।

ঐ রাতে সে বেশ আরাম করে ঘুমাচ্ছিল। হঠাৎ বৃষ্টি হবার কারণে চারদিক বেশ ঠাণ্ডা। জানালা দিয়ে ফুরফুরে বাতাস আসছে। ঘুমুবার জন্যে চমৎকার রাত। একঘুমে সে কখনো রাত পার করতে পারে না। মাঝখানে একবার তাকে উঠে পানি খেতে হয় কিংবা রাথরুমে যেতে হয়। সেই রাতেও পানি খাবার জন্যে উঠল। জাভেদ কাত হয়ে ঘুমুচ্ছে। গায়ে পাতলা চাদর দিয়ে রেখেছে। অদ্ভুত অভ্যাস মানুষটার, যত গরমই পড়ুক গায়ে চাদর দিয়ে রাখবে। প্রিয়াংকা খুব সাবধানে গায়ের চাদর সরিয়ে দিল। আহা আরাম করে ঘুমুক। কেমন ঘেমে গেছে।

স্বামীকে ডিঙিয়ে বিছানা থেকে নামল। স্বামীকে ডিঙিয়ে ওঠানামা করা ঠিক হচ্ছে না— হয়তো পাপ হচ্ছে। কিন্তু উপায় কী, প্রিয়াংকা ঘুমোয় দেয়ালের দিকে। খাট থেকে নামতে হলে স্বামীকে ডিঙাতেই হবে।

তাদের শোবার ঘর অন্ধকার, তবে পাশের ঘরে বাতি জ্বলছে। এই একটা বাতি সারারাতই জ্বলে, ঘরটা জাভেদের লাইব্রেরি ঘর। এই ঘরেই জাভেদ পরীক্ষার খাতা দেখে, পড়াশোনা করে। ঘরে আসবাবপত্র তেমন কিছু নেই। একটা বুকশেলফে কিছু বই, পুরনো ম্যাগাজিন। একটা বড় টেবিল। টেবিলের উপর রাজ্যের পরীক্ষার খাতা। একটা ইজিচেয়ার। ইজিচেয়ারের পাশে সাইড টেবিলে টেবিল-ল্যাম্প।

দরজার ফাঁক দিয়ে স্টাডিরুমের আলোর কিছুটা প্রিয়াংকাদের শোবার ঘরেও আসছে, তবুও ঘরটা অন্ধকার। স্যান্ডেল খুঁজে বের করতে অনেকক্ষণ মেঝে হাতড়াতে হলো। স্যান্ডেল পায়ে পরামাত্র পাশের ঘরে কিসের যেন একটা শব্দ হলো।

ভারী অথচ মৃদু গলায় কেউ একজন কাশল, ইজিচেয়ার টেনে সরাল। নিশ্চয়ই মনের ভুল। তবু প্রিয়াংকা আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। না– আর কোনো শব্দ নেই। শুধু সদর রাস্তা দিয়ে দ্রুতবেগে ট্রাক যাওয়া-আসা করছে। তা হলে একটু আগে পাশের ঘরে কে শব্দ করছিল ? অবিকল নিশ্বাস নেবার শব্দ। প্রিয়াংকা দরজা ঠেলে পাশের ঘরে ঢুকেই জমে পাথর হয়ে গেল। ইজিচেয়ারে জাভেদ বসে আছে। হাতে বই। জাভেদ বই থেকে মুখ তুলে তাকাল। নরম গলায় বলল, কিছু বলবে ? কতটা সময় পার হয়েছে ? এক সেকেন্ডের একশো ভাগের এক ভাগ, না অনন্তকাল ? প্রিয়াংকা জানে না। সে শুধু জানে সে ছুটে চলে এসেছে শোবার ঘরে— ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিছানায়। তার সমস্ত শরীর কাঁপছে— সে কি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে ? নিশ্চয়ই অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। ঘর দুলছে, চারদিকের বাতাস অসম্ভব ভারী ও উষ্ণ। জাভেদ জেগে উঠেছে। সে বিছানায় পাশ ফিরতে ফিরতে বলল, কী ?

প্রিয়াংকা বলল, কিছু না। জাভেদ ঘুমজড়ানো স্বরে বলল, ঘুমাও। জেগে আছ কেন ? বলতে বলতেই ঘুমে জাভেদ এলিয়ে পড়ল। জাভেদকে জড়িয়ে ধরে সারারাত জেগে রইল প্রিয়াংকা। একটি দীর্ঘ ও ভয়াবহ রাত। স্বামীকে জড়িয়ে ধরে প্রিয়াংকা শুয়ে আছে। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় পাশের ঘরে। সে স্পষ্টই শুনছে ছোটখাটো শব্দ, ইজিচেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালে যেমন ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হয় সেরকম শব্দ, গলার শ্লেষ্মা পরিষ্কার করার শব্দ। শেষরাতের দিকে শোনা গেল বারান্দায় পায়চারির শব্দ। কেউ-একজন বারান্দার এ-মাথা থেকে ও-মাথায় যাচ্ছে আবার ফিরে আসছে। এইসব কি কল্পনা ? নিশ্চয়ই কল্পনা। রাস্তা দিয়ে ট্রাক যাওয়ার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ আসছে না।

www.BDeBooks.Com

ফজরের আজানের পর প্রিয়াংকার চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল। ঘুম ভাঙল বেলা সাড়ে ন'টায়। ঘরের ভেতর রোদ ঝলমল করছে। জাভেদ চলে গেছে কলেজে। মরিয়ম জিতু মিয়ার সঙ্গে তারস্বরে ঝগড়া করছে। প্রিয়াংকার সব ভয় কর্পূরের মতো উবে গেল। রাতে সে যে অসম্ভব ভয় পেয়েছিল এটা ভেবে এখন নিজেরই কেমন হাসি পাচ্ছে। সে স্বপ্ন দেখেছিল। স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই না। মানুষ কতরকম দুঃস্বপ্ন দেখে। এও একটা দুঃস্বপ্ন। এর বেশি কিছু না। মানুষ তো এর চেয়েও ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখে। সে নিজেই কতবার দেখেছে। একবার স্বপ্নে দেখেছিল সম্পূর্ণ নগ্নগায়ে বাসে করে কোথায় যেন যাচ্ছে। ছি ছি, কী ভয়ংকর স্বপ্ন!

প্রিয়াংকা বিছানা থেকে নামতে নামতে ডাকল, মরিয়ম!

'জে আম্মা।'

'ঝগড়া করছ কেন মরিয়ম ?'

'জিতু কাচের জগটা ভাইঙ্গা ফেলছে আম্মা।'

'চিৎকার করলে তো জগ ঠিক হবে না। চিৎকার করবে না।'

'জিনিসের উপর কোনো মায়া নাই... মহব্বত নাই...'

'ঠিক আছে তুমি চুপ করো। তোমার স্যার কি চলে গেছেন ?'

'জে।'

'কখন আসবেন কিছু বলে গেছেন ?'

'দুপুরে খাইতে আসবেন।'

'আচ্ছা যাও, তুমি আমার জন্যে খুব ভালো করে এক কাপ চা বানিয়ে আনো।'

'নাশতা খাইবেন না আম্মা ?'

'না। তোমার স্যার নাশতা করেছে ?'

'জে।'

মরিয়ম চা আনতে গেল। প্রিয়াংকা মুখ ধুয়ে চায়ের কাপ নিয়ে বসল। এখন তার করার কিছুই নেই। দুজন মানুষের সংসার। কাজ তেমন কিছু থাকে না। এ সংসারে কাজকর্ম যা আছে সবই মরিয়ম দেখে এবং খুব ভালোমতোই দেখে। চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া প্রিয়াংকার কোনো কাজ নেই। এই ফ্ল্যাটে অনেক গল্পের বই আছে। গল্পের বই পড়তে প্রিয়াংকার ভালো লাগে না। ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষার জন্যে পড়াশোনা করা দরকার। পড়তে ভালো লাগে না। কারণ প্রিয়াংকা জানে পড়ে লাভ হবে

না। সে পাস করতে পারবে না। কোনো একটা কলেজেই তাকে বিএ পড়তে হবে। কে জানে হয়তো জাভেদের কলেজেই। যদি তা-ই হয় তা হলে জাভেদ কি তাকে পড়াবে ? ক্লাসে তাকে কী ডাকবে— স্যার ?

চায়ের কাপ নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই মরিয়ম তাকে একটা চিঠি দিল।

'কিসের চিঠি মরিয়ম ?'

'স্যার দিয়ে গেছে।'

চিঠি না— চিরকুট। জাভেদ লিখেছে— প্রিয়াংকা, তোমার গা-টা গরম মনে হলো। তৈরি হয়ে থেকো, আমি দুপুরে তোমাকে একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।

প্রিয়াংকার মনটা হঠাৎ ভালো হয়ে গেল। মানুষটা ভালো। হৃদয়বান এবং বুদ্ধিমান। স্বামীদের কতরকম অন্যায় দাবি থাকে— তার তেমন কিছু নেই। অন্যদের দিকেও খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। প্রিয়াংকা কেন, আজ যদি জিতু মিয়ার জ্বর হয় তাকেও সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। জাভেদ এমন একজন স্বামী যার ওপর ভরসা করা যায়।

যে যা-ই বলুক, এই মানুষটাকে স্বামী হিসেবে পেয়ে তার খুব লাভ হয়েছে। জাভেদের আগে একবার বিয়ে হয়েছে সেটা নিশ্চয়ই অপরাধ নয়। বেচারার স্ত্রী মারা গেছে বিয়ের আটমাসের মাথায়। স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে বিয়ে করার জন্যেও অস্থির হয়ে পড়েনি। দু'বছর অপেক্ষা করেছে। মামা মামি যে তাকে দোজবর একটি ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন এই নিয়েও প্রিয়াংকার মনে কোনো ক্ষোভ নেই। মামা দরিদ্র মানুষ। তিনি আর কত করবেন! যথেষ্টই তো করেছেন। মামি নিজের গয়না ভেঙে তাকে গয়না করে দিয়েছেন। ক'জন মানুষ এরকম করে ? আট-ন'টা নতুন শাড়ি কিনে দিয়েছেন। এর মধ্যে একটা শাড়ি আছে বারোশো টাকা দামের।

জাভেদের আগের স্ত্রীর অনেক শাড়ি এই ঘরে রয়ে গেছে। ঐ মেয়েটির শাড়ির দিকে তাকালেই মনে হয় খুব শৌখিন মেয়ে ছিল। ড্রেসিংটেবিল ভরতি সাজগোজের জিনিস। কিছুই ফেলে দেয়া হয়নি। বসার ঘরে মেয়েটির বড় একটি বাঁধানো ছবি আছে। খুব সুন্দর মুখ। তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।

এই ডাক্তার জাভেদের বন্ধু।

কাজেই ডাক্তার অনেক আজেবাজে রসিকতা করল— যেমন হাসিমুখে বলল ভাবিকে এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন ? সংসারে নতুন কেউ আসছে নাকি ? হা-হা-হা। বুদ্ধিমান হয়ে ঠিক কাজটি করে ফেলেননি তো ?

www.BDeBooks.Com

দু-সপ্তাহও হয়নি যার বিয়ে হয়েছে তার সঙ্গে কি এরকম রসিকতা করা যায় ? রাগে প্রিয়াংকার গা জ্বলতে লাগল।

ডাক্তার তাকে একগাদা ভিটামিন দিলেন এবং বললেন, ভাবিকে মনে হচ্ছে রাতে ঘুমুতে-টুমুতে দেয় না। দুপুরে ঘুমিয়ে পুষিয়ে নেবেন, নয়তো শরীর খারাপ করবে— হা-হা-হা।

প্রিয়াংকা বাড়ি ফিরল রাগ করে। সন্ধ্যা মেলাবার পর সেই রাগ ভয়ে রূপান্তরিত হলো। সীমাহীন ভয় তাকে গ্রাস করে ফেলল। এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যেতে ভয়। বারান্দায় যেতে ভয়। হাতমুখ ধুতে বাথরুমে গিয়েছে— বাথরুমের দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো আর সে দরজা খুলতে পারবে না। দরজা আপনাআপনি আটকে গেছে। সে দরজা খোলার চেষ্টা না করেই কাঁপা গলায় ডাকতে লাগল— মরিয়ম, ও মরিয়ম! মরিয়ম!

রাতে আবার ঐদিনের মতো হলো। জাভেদ পাশেই প্রায় নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে আর প্রিয়াংকা স্পষ্টই শুনছে স্যান্ডেল পরে বারান্দায় কে যেন পায়চারি করছে। প্রিয়াংকা নিজেকে বোঝাল— ও কেউ না, ও হচ্ছে মরিয়ম। মরিয়ম হাঁটছে। ছোট ছোট পা ফেলছে। মরিয়ম ছাড়া আর কে হবে ? নিশ্চয়ই মরিয়ম। স্যান্ডেলে কেমন ফটফট শব্দ হচ্ছে। জাভেদ যখন স্যান্ডেল পরে হাঁটে তখন এরকম শব্দ হয় না। একবার কি বারান্দায় উঁকি দিয়ে দেখবে ? কী হবে উঁকি দিলে ? কিছুই হবে না। ভয়টা কেটে যাবে। রাত একটা বাজে— এমন কিছু রাত হয়নি। রাত একটায় ঢাকা শহরের অনেক দোকানপাট খোলা থাকে। এই তো পাশের ফ্ল্যাটের বাচ্চাটা কাঁদছে। এখন নিশ্চয়ই বারান্দায় যাওয়া যায়।

খুব সাবধানে জাভেদকে ডিঙিয়ে প্রিয়াংকা বিছানা থেকে নামে। তার হাত-পা কাঁপছে, তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে, কানের কাছে কেমন ঝাঁ ঝাঁ শব্দ হচ্ছে। সব অগ্রাহ্য করে বারান্দায় চলে এল। আর তার সঙ্গে সঙ্গে বারান্দায় দাঁড়ানো মানুষটা বলল, প্রিয়াংকা এক গ্লাস পানি দাও তো!

বিছানায় যে-মানুষটা শুয়ে আছে এই মানুষটাই সেই জাভেদ। তার পরনে জাভেদের মতোই লুঙ্গি, হাতকাটা গেঞ্জি। মুখ গম্ভীর ও বিষণ্ন।

প্রিয়াংকা ছুটে শোবার ঘরে চলে এল। কোনোমতে বিছানায় উঠল— ঐ তো জাভেদ ঘুমুচ্ছে। গায়ে চাদর টানা— এতক্ষণ যা দেখেছি ভুল দেখেছি। যা শুনেছি তাও ভুল। কিছু-একটা আমার হয়েছে। ভয়ংকর

কোনো অসুখ। সকাল হলে আমার এই অসুখ থাকবে না। আল্লাহ্ তুমি সকাল করে দাও। খুব তাড়াতাড়ি সকাল করে দাও। সব মানুষ জেগে উঠুক। সূর্যের আলোয় চারদিক ভরে যাক। সে জাভেদকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। জাভেদ ঘুম-ঘুম গলায় বলল, কী হয়েছে ?

সকালবেলা সত্যি সব স্বাভাবিক হয়ে গেল। রাতে এরকম ভয় পাওয়ার জন্যে লজ্জা লাগতে লাগল। জাভেদ কলেজে চলে যাবার পর সে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মরিয়মকে তরকারি কাটায় সাহায্য করতে গেল। মরিয়ম বলল, আফার শইল কি খারাপ ?'

'না।'

'আফনের কিছু করন লাগত না আফা। আফনে গিয়ে হুইয়া থাকেন।'

'এইমাত্র তো ঘুম থেকে উঠলাম, এখন আবার কী শুয়ে থাকব ?'

'চা বানায়া দেই ?'

'দাও। আচ্ছা মরিয়ম, তোমার আগের আপাও কি আমার মতো চা খেত ?'

'হ। তয় আফনের মতো চুপচাপ থাকত না। সারাদিন হইচই করত। গান-বাজনা করত।'

'মারা গেলেন কীভাবে ?'

'হঠাৎ মাথাডা খারাপ হইয়া গেল। উল্টাপাল্টা কথা কওয়া শুরু করল— কী জানি দেখে।'

প্রিয়াংকা শঙ্কিত গলায় বলল, কী দেখে ?

'দুইটা মানুষ নাকি দেখে। একটা আসল একটা নকল। কোনটা আসল কোনটা নকল বুঝতে পারে না।'

'তুমি কী বলছ তাও তো আমি বুঝতে পারছি না!'

'পাগল মাইনষের কথার কি ঠিক আছে আফা ? নেন চা নেন।'

প্রিয়াংকা মাথা নিচু করে চায়ের কাপে ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছে। একবারও মরিয়মের দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে না। তার ধারণা, তাকালেই মরিয়ম অনেক কিছু বুঝে ফেলবে। বুঝে ফেলবে যে প্রিয়াংকারও একই অসুখ হয়েছে। সে চায় না মরিয়ম কিছু বুঝুক। কারণ তার কিছুই হয়নি। অসুখ করেছে। অসুখ কি মানুষের করে না ? করে। আবার সেরেও যায়। তারটাও সারবে।

www.BDeBooks.Com

রাত গভীর হচ্ছে। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে টুপ টুপ করে। খোলা জানালায় হাওয়া আসছে। প্রিয়াংকা জাভেদকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে। তার চোখে ঘুম নেই।

পাশের ঘরে বইয়ের পাতা ওলটানোর শব্দ হচ্ছে। এই যে সিগারেট ধরাল। সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ ভেসে আসছে। ইজিচেয়ার থেকে উঠল— ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে ইজিচেয়ারে।

প্রিয়াংকা স্বামীকে সজোরে জড়িয়ে ধরে কাঁপা গলায় ডাকল, এই-এই।

ঘুম ভেঙে জাভেদ বলল, কী ?

প্রিয়াংকা ফিসফিস করে বলল, কিছু না। তুমি ঘুমাও।

বেয়ারিং চিঠি

জমির সাহেব অফিস থেকে ফেরামাত্রই তাঁর বড় মেয়ে মিতু বলল, বাবা আজ তোমার একটা চিঠি এসেছে। বলেই সে মুখের হাসি গোপন করার জন্যে অন্যদিকে তাকাল।

মিতুর বয়স একুশ। এই বয়সের মেয়েদের মুখে অকারণে হাসি আসে। হাসি তামাশা জমির সাহেবের একেবারেই পছন্দ নয়, বিশেষ করে মা-বাবাকে নিয়ে হাসাহাসি। আজকাল অনেক পরিবারেই তিনি এই ব্যাপার দেখেন। মেয়ে বাবার সঙ্গে বসে আড্ডা দিচ্ছে— খিলখিল করে হাসছে। এসব কী ? তিনি একবার তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেই বন্ধুর মেয়ে বাবাকে নিয়ে খুব হাসি তামাশা করতে লাগল। এক পর্যায়ে বলে ফেলল, বাবা দিন-দিন তোমার চেহারা সুন্দর হচ্ছে। রাস্তায় বের হলে নিশ্চয়ই মেয়েরা তোমার দিকে তাকায়। জমির সাহেব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁর নিজের মেয়ে হলে চড় দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিতেন। অন্যের মেয়ে বলে কিছু বলা গেল না। তবে ঐ বন্ধুর বাড়িতে যাওয়া তিনি ছেড়ে দিলেন।

মিতু চিঠিটি বাবার দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বলল, বেয়ারিং চিঠি বাবা। দুটাকা দিয়ে চিঠি রাখতে হয়েছে। বলে আবার ফিক করে হেসে ফেলল।

জমির সাহেব কঠিন গলায় বললেন, হাসছিস কেন ? বেয়ারিং চিঠি এসেছে এর মধ্যে হাসির কী হলো ? এরকম ফাজলামি শিখছিস কোথায় ?

মিতু মুখ কালো করে চলে গেল। বাবাকে সে সঙ্গত কারণেই অসম্ভব ভয় পায়। জমির সাহেব লক্ষ করলেন খামের মুখ খোলা। এরা চিঠি

www.BDeBooks.Com

পড়েছে। এই বেআদবিও সহ্য করা মুশকিল। একজনের চিঠি অন্যজন পড়বে কেন ? খামে তাঁর নাম লেখা দেখার পরেও এরা কোন সাহসে চিঠি খোলে ? রাগে জমির সাহেবের গাঁ কাপতে লাগল। এই অবস্থায় তিনি চিঠি পড়লেন। একবার, দুবার, তিনবার। তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল। সুস্মিতা নামের এক মেয়ের চিঠি। তাঁর কাছে লেখা। সম্বোধন হচ্ছে প্রিয়তমেষু। এর মানে কী ? সুস্মিতা কে ? সুস্মিতা নামের কাউকেই তিনি চেনেন বলে মনে করতে পারলেন না। কলেজে পড়ার সময় কমলা নামের এক মেয়ের প্রতি খুব দুর্বলতা অনুভব করেছিলেন। মেয়েটির বিয়ে হয়ে যাবার পর দুর্বলতা কেটে যায়। এ ছাড়া অন্য কোনো মেয়েকে তিনি চেনেন না। জমির সাহেব কপালের ঘাম মুছে চতুর্থবারের মতো চিঠিটি পড়লেন।

প্রিয়তমেষু,
তুমি কেমন আছ ? তোমার কথা খুব মনে হয়। তোমার শরীর এত খারাপ হয়েছে কেন ? শরীরের আরো যত্ন নেবে। আমি দেখেছি তুমি বাসে যাওয়া-আসা কর। তোমাকে অনুরোধ করছি সপ্তাহখানেক বাসে উঠবে না। কাল তোমাকে নিয়ে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। দুঃস্বপ্নটা হচ্ছে তুমি বাসে উঠতে গিয়ে পিছলে পড়ে পা ভেঙে ফেলেছ। স্বপ্নকে গুরুত্ব দেয়ার কোনো মানে হয় না। তবু অনুরোধ করছি এক সপ্তাহ বাসে উঠবে না।

বিনীতা
তোমার সুস্মিতা।

জমির সাহেব পঞ্চমবারের মতো চিঠি পড়তে শুরু করলেন। মোটা নিবের কলমে গোটাগোটা অক্ষরের চিঠি। চিঠিতে তারিখ বা ঠিকানা নেই। হলুদ রঙের কাগজ। কাগজ থেকে হালকা ন্যাপথালিনের গন্ধ আসছে।

'বাবা তোমার চা।'

মিতু চায়ের কাপ এনে বাবার সামনে রাখল। তার মুখ থমথম করছে। বাবার ধমকের কথা সে এখনও ভুলতে পারেনি। জমির সাহেব মেয়ের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, কে লিখল কিছুই বুঝতে পারছি না। সুস্মিতা নামের কাউকে চিনি না।

মিতু বলল, চিনি হয়েছে কি না দ্যাখো।

জমির সাহেব চায়ের চিনির ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখালেন না। শুকনো গলায় বললেন, তোর মা এই চিঠি পড়েছে ?

'হ্যাঁ।'

'বলেছে কিছু ?'

'না।'

'বুঝলি মিতু, সুস্মিতা নামের কাউকেই চিনি না। আর ধর যদি চিনতামও তাহলে কি এইরকম একটা চিঠি কেউ লিখতে পারে ? ছি ছি, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।'

মিতু ইতস্তত করে বলল, আমার কী মনে হয় জান বাবা ? আমার মনে হয়, এই বাড়িতে জমির সাহেব বলে কেউ ছিলেন। চিঠিটা তাঁকেই লেখা।

জমির সাহেবের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এই সহজ সমাধান তাঁর মাথায় কেন আসেনি বুঝতে পারলেন না। মিতু মেয়েটার মাথা তো বেশ ভালো। সায়েন্সে দেয়া উচিত ছিল। গাধার মতো তিনি মেয়েটাকে আর্টস পড়িয়েছেন।

তিনি চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, খুব ভালো চা হয়েছে মা, খুব ভালো। তোমার মা কোথায় ?

'নানুর বাড়ি গেছে।'

'মা নানুর বাড়ি গেছে' এই বাক্যটি জমির সাহেবের খুব অপছন্দের বাক্য। শাহানার মা'র বাড়ি মীরপুর ছ'নম্বরে। ঐ বাড়িতে গেলেই শাহানা রাতটা থেকে যায়। আজও থেকে যাবে। তবে আজ জমির সাহেব অন্যদিনের মতো খারাপ বোধ করলেন না। শাহানা থাকলে নিশ্চয়ই চিঠিটা নিয়ে গম্ভীর গলায় কথা বলত। শাহানার কথা শুনতেই ইদানীং তাঁর অসহ্য লাগে। রাগী-রাগী কথা তো আরো অসহ্য লাগবে।

'মিতু!'

'জী বাবা ?'

'তোর মা বোধহয় থেকে যাবে ও-বাড়িতে।'

'হ্যাঁ।'

'তোর মা কিছু বলেনি চিঠি পড়ে ?'

'না।'

'তোর কি মনে হয় রাগ করেছে ?'

'রাগ করেছিল আমি বুঝিয়ে বলেছি।'

www.BDeBooks.Com

মেয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায় জমির সাহেবের মন ভরে গেল। মেয়েটাকে সায়েন্স পড়ানো উচিত ছিল। সায়েন্স না পড়িয়ে ভুল হয়েছে। আর্টস পড়বে গাধা টাইপের মেয়েরা। তাঁর মেয়ে গাধা টাইপ নয়। বুদ্ধি আছে। বাপের প্রতি ফিলিংস আছে।

পরদিন যথারীতি জমির সাহেব অফিসে রওনা হলেন। একবার মনে হলো বাসে না গিয়ে একটা রিকশা নিয়ে নেবেন। পরমুহূর্তেই এই চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেললেন। ফালতু একটা চিঠি নিয়ে কিছু ভাবার কোনো মানে হয় ? এইসব জিনিস প্রশ্রয় দেয়াই উচিত না। ঝিকাতলার মোড়ে অন্যসব অফিসযাত্রীর মতো তিনি একটা টিফিনবক্স এবং ছাতা-হাতে বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন এবং যথারীতি প্রচণ্ড ভিড়ে ঠেলাঠেলি করে বাসে উঠে পড়লেন। বাস ছেড়ে দিল। সেই মুহূর্তে কিছু-একটা হলো তাঁর। মনে হলো ছিটকে বাস থেকে পড়ে যাচ্ছেন। তিনি একসঙ্গে অনেক লোকের চিৎকার শুনলেন— থামো, থামো, থামো— এই রুককে, রুককে—

জমির সাহেব রাস্তায় ছিটকে পড়ে জ্ঞান হারালেন। জ্ঞান হলো হাসপাতালে। তাঁর বাম পা হাঁটুর নিচে ভেঙেছে। এক জায়গায় না— দু-জায়গায়। মিতু এবং শাহানা মাথার কাছে বসে আছে। দুজনই কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে। সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের ডাক্তার সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, কাঁদছেন কেন ? বললাম তো তেমন সিরিয়াস কিছু হয়নি। দিন পনেরোর মধ্যে সুস্থ হয়ে বাসায় যাবে। দুটা ফ্রাকচার হয়েছে তবে সিরিয়াস কিছু না।

ডাক্তারের কথামতো পনেরো দিনের মাথাতেই জমির সাহেব বাড়ি ফিরলেন। তবে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে নয়। বাঁ পা অচল হয়ে গেল। এদেশে নাকি কিছু করা সম্ভব না, বিদেশে যদি কিছু হয়। চাকরি শেষ হবার আগেই জমির সাহেব রিটায়ার করলেন। তিনি এবং তাঁর পরিবারের কেউ ঐ হলুদ চিঠির কথা একবারও তুলল না। যেন ঐ চিঠি একটা অভিশপ্ত চিঠি। তার কথা তোলা উচিত না। চিঠিটা জমির সাহেবের শোবার ঘরের টেবিলের তিন নম্বর ড্রয়ারে পড়ে রইল। মাঝে মাঝে জমির সাহেব চিঠিটা বের করে পড়েন এবং তাঁর অচল পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন। সেই রাতে তাঁর একফোঁটা ঘুম হয় না। কেমন ভয়-ভয় লাগতে থাকে।

নতুন বছরের গোড়াতে ঝিকাতলার বাসা উঠিয়ে উত্তর শাহজাহানপুরে সস্তায় একটা ফ্ল্যাটে তাঁরা চলে গেলেন। রোজগার কমেছে, এখন টাকা-পয়সা সাবধানে খরচ করতে হবে। নতুন ফ্ল্যাটে দুটা মাত্র শোবার ঘর। একটিতে জমির সাহেব শাহানাকে নিয়ে থাকেন, অন্যটিতে মিতু আর তার

ছোট বোন ইরা থাকে। জমির সাহেবের বড় ছেলে থাকে বসার ঘরে। একটা খাট ঘরে গাদাগাদি করে রাখা হয়েছে। এই বাড়িতে মাস তিনেক কাটানোর পর আরেকটি বেয়ারিং চিঠি এল। আগের মতো গোটাগোটা হরফে লেখা। মোটা কলমের নিব দিয়ে মেয়েলি অক্ষরে সুস্মিতা লিখেছে—

প্রিয়তমেষু,

তুমি কেমন আছ ? এত দুশ্চিন্তা করছ কেন ? তোমাকে দুশ্চিন্তা করতে দেখলে আমার ভালো লাগে না। সংসারে দুঃখ কষ্ট সমস্যা থাকেই। এতে বিচলিত হলে চলে ? মনে সাহস রাখো। আচ্ছা একটা কথা, তোমার বড় ছেলেটাকে কিছুদিন ঢাকা শহরের বাইরে রাখতে পার না ? আমার কেন জানি মনে হচ্ছে কোনো ঝামেলায় পড়ে যাবে। তোমাদের গ্রামের বাড়িতে ওকে কিছুদিনের জন্যে পাঠিয়ে দাও না। ও যেতে চাইবে না। বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজি করাও।

বিনীতা
তোমার সুস্মিতা

এবার আর সুস্মিতার চিঠি নিয়ে কেউ হাসাহাসি করল না। চিঠি পড়ার সময় শাহানার হাত থরথর করে কাঁপতে লাগল। জমির সাহেব অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেলেন। বড় ছেলে সুমনকে গ্রামের বাড়িতে পাঠানোর প্রশ্নই ওঠে না। কারণ তার বি.এ. ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হয়েছে। দুটা পেপার হয়ে গেছে। তবু শাহানা বললেন, থাক, পরীক্ষা দিতে হবে না। ওকে পাঠিয়ে দাও।

জমির সাহেব বললেন, দরকার আছে বলে তো মনে হয় না। চিঠি পাওয়ার পরেও তো পনেরো দিন হয়ে গেল।

'হোক পনেরো দিন, পাঠিয়ে দাও। আমার ভালো লাগছে না।'

'আচ্ছা বলে দ্যাখো। যদি যেতে রাজি হয় তাহলে যাক।

সুমন যেতে রাজি হলো। শুধু যে রাজি হলো তা-ই না, তৎক্ষণাৎ যেতে রাজি। টাকা দিলে আজ রাতের ট্রেনেই রওনা হয়ে যায় এমন অবস্থা। ঠিক হলো সে সোমবার সকালের ট্রেনে যাবে। জমির সাহেবও সঙ্গে যাবেন। পৈতৃক বাড়ি ঠিকঠাক করবেন, জমিজমার খোঁজখবর করবেন। সম্ভব হলে কিছু জমি বিক্রি করে আসবেন। টাকা-পয়সার খুব টানাটানি যাচ্ছে।

www.BDeBooks.Com

তাদের যাবার কথা সোমবার। তার আগের দিন অর্থাৎ রোববার ভোররাতে পুলিশ এসে জমির সাহেবের বাড়ি ঘেরাও করে সুমনকে ধরে নিয়ে গেল। হতভম্ব জমির সাহেবকে পুলিশ সাবইন্সপেক্টর আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন— আপনার ছেলের বিরুদ্ধে মার্ডার চার্জ আছে। সাত দিন আগে চারজনে মিলে খুনটা করেছে। কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার। আপনার ছেলে এই চারজনের একজন। আপনি বুঝিয়ে-সুজিয়ে ছেলেকে রাজসাক্ষী হতে রাজি করান। এতে আপনারও লাভ, আমাদেরও লাভ। না হলে কিন্তু ফাঁসিটাসি হয়ে যাবে। পলিটিক্যাল প্রেশারও আছে।

সুমন রাজসাক্ষী হতে রাজি হলো না। দীর্ঘদিন মামলা চলল। রায় বেরুতে লাগল দুবছর। তিনজনের সাত বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড, একজনের ফাঁসি। সেই একজন সুমন। অন্য তিনজন ছেলেটাকে ধরে রেখেছিল। খুন করেছে সুমন। ধারালো ক্ষুর দিয়ে রগ কেটে দিয়েছে।

পাঁচ বছর কেটে গেছে। পরবর্তী বেয়ারিং চিঠিটা এল পাঁচ বছর কাটার পর। এই পাঁচ বছরে জমির সাহেবের সংসারে বড়রকমের ওলটপালট হয়েছে। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। মিতুর বিয়ে হয়েছে কৃষিখামারের এক ম্যানেজারের সঙ্গে। সে স্বামীর সঙ্গে গোপালপুরে থাকে। ছোট মেয়ে ইরার বিয়ে হয়েছে ওষুধ কোম্পানির এক কেমিস্টের সঙ্গে। তারা ঢাকা শহরেই থাকে। প্রায়ই বাবা-মাকে দেখতে আসে। বড় মেয়ের কোনো ছেলেপুলে হয়নি। ছোট মেয়ের একটা ছেলে হয়েছে। ছেলের নাম ফরহাদ। এই ছেলেটি জমির সাহেবের খুব ভক্ত। তাঁর কাছে এলেই কোলে উঠে বসে থাকে, কিছুতেই কোল থেকে নামানো যায় না।

পাঁচ বছর পর একদিন পিওন এসে বলল, স্যার আপনার একটা বেয়ারিং চিঠি আছে, রাখবেন ? জমির সাহেব শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

সেদিন ইরারা বেড়াতে এসেছে। জমির সাহেবের কোলে ফরহাদ। তিনি ফরহাদকে মাটিতে নামিয়ে চিঠি হাতে নিলেন। হাতের লেখা চিনতে তাঁর অসুবিধা হলো না। সেই হাতের লেখা। সেই ন্যাপথালিনের গন্ধ!

পিওন বলল, চার টাকা লাগবে।

জমির সাহেব একবার ভাবলেন বলবেন, চিঠি রাখব না। তিনি তা বলতে পারলেন না।

যন্ত্রের মতো পকেটে হাত দিয়ে টাকা বের করলেন। চিঠি পাঞ্জাবির পকেটে রেখে দিলেন, কাউকে কিছু বললেন না। তাঁর বমি-বমি ভাব হলো। মাথা ঘুরতে লাগল।

রাতে তিনি কিছু খেলেন না। ইরাদের আসা উপলক্ষে ভালোমন্দ রান্না হয়েছিল, তিনি কিছুই মুখে দিলেন না। ইরা বলল, 'বাবা তোমার কী হয়েছে ?'

তিনি ক্ষীণস্বরে বললেন, কিছু হয়নি। শরীরটা ভালো না।

'রোজই তুমি বল শরীর ভালো না, অথচ একজন ভালো ডাক্তার দেখাও না। একজন ভালো ডাক্তার দেখাও বাবা।'

'দেখাব।'

'আর মাকেও একজন ভালো ডাক্তার দেখাও।'

'আচ্ছা।'

'আচ্ছা না বাবা। দেখাও।'

মেয়ে-জামাই রাত ন'টার দিকে চলে গেল। ফরহাদ গেল না। সে নানার সঙ্গে থাকবে।

সারারাত জমির সাহেবের ঘুম হলো না। পরদিন হুহু করে গায়ে জ্বর এসে গেল। জ্বরের মূল কারণ কাউকে বলতে পারলেন না। বেলা যতই বাড়তে লাগল জ্বর ততই বাড়তে লাগল। দুপুরের পর ঘাম হতে লাগল। ইরা হতভম্ব হয়ে বলল, বাবা চলো তোমাকে ক্লিনিকে নিয়ে ভর্তি করি। আমার কিছু ভালো লাগছে না। তুমি এরকম ঘামছ কেন ? হার্টের কোনো সমস্যা না তো ?

জমির সাহেব ক্ষীণস্বরে বললেন, চিঠি পেয়েছি।

'চিঠি পেয়েছি মানে ? কার চিঠি ?'

'বেয়ারিং চিঠি।'

ইরা দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, কী লেখা এবারের চিঠিতে ?

'চিঠি পড়িনি।'

'পড়ে দ্যাখো। না পড়েই এরকম করছ কেন ? হয়তো এবার কোনো ভালো খবর আছে।'

জমির সাহেব কাঁপা গলায় বললেন, ভয় লাগছে রে ইরা!

ইরা চিঠি খুলে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেল। অন্যদের সেই চিঠি দেখাল। যারা দেখল প্রত্যেকেই গম্ভীর হলো, কারণ চিঠিতে কিছু লেখা নেই। সাদা একটা পাতা, শেষে নাম সই করা— বিনীত, তোমার সুস্মিতা। এই সাদা না-লেখা অংশে কী বলতে চাচ্ছে সুস্মিতা ? কে সে ? কেনইবা সে চিঠি লেখে ? আবার আজ কেনইবা লিখল না ?

www.BDeBooks.Com

বীণার অসুখ

বীণার বয়স একুশ।

সে লালমাটিয়া কলেজে বি.এ. সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ত। বীণার মামা ইদরিস সাহেব একদিন হঠাৎ বললেন, বীণা তোর কলেজে যাবার দরকার নেই। বাসায় থেকে পড়াশোনা কর। পরীক্ষার সময় পরীক্ষা দিলেই হবে। কলেজে আজকাল কী পড়াশোনা হয় তা তো জানাই আছে। যাওয়া না-যাওয়া একই।

বীণা ঘাড় নেড়ে ক্ষীণস্বরে বলল, জী আচ্ছা।

মামার কথার ওপর কথা বলার সাহস বীণার নেই। তার পড়াশোনার যাবতীয় খরচ মামা দেন। গত বছর গলার একটা চেন বানিয়ে দিয়েছেন। তা ছাড়া তার বিয়ের কথা হচ্ছে। বিয়ে যদি ঠিক হয় সেই খরচও মামাকেই দিতে হবে। বীণার বাবা প্যারালাইসিস হয়ে দেশের বাড়িতে পড়ে আছেন। তাঁর পক্ষে একটা টাকাও খরচ করা সম্ভব না। তিনি সবার কাছ থেকে টাকা নেন। কাউকে কিছু দেননি।

ইদরিস সাহেব বললেন, বীণা তুই আমাকে এক গ্লাস শরবত বানিয়ে দে। আর শোন, কলেজে না যাওয়া নিয়ে মন-টন খারাপ করিস না। মন-খারাপের কিছু নেই।

'জী আচ্ছা মামা।'

বীণা শরবত আনতে চলে গেল। তার মনটা অসম্ভব খারাপ। কলেজ বন্ধ করে দেবার কোনো কারণ সে বুঝতে পারছে না। জিজ্ঞেস করার সাহসও নেই। দিনের পর দিন ঘরে বসে থেকেই-বা সে কী করবে ?

শরবত বানাতে বানাতে তার মনে হল— হয়তো তার বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেছে। গফরগাঁয়ের ঐ ছেলে শেষ পর্যন্ত হয়তো রাজি হয়েছে। ওরাই হয়তো বলেছে— মেয়েকে কলেজে পাঠাবেন না। বিয়ে ঠিকঠাক হলে ছেলেপক্ষের লোকজন অদ্ভুত অদ্ভুত শর্ত দিয়ে দেয়।

গফরগাঁয়ের ঐ ছেলেটাকে একেবারেই পছন্দ হয়নি। কেমন যেন পশু-পশু চেহারা। সোফায় বসেছিল দুই হাঁটুতে দুহাত রেখে। মুখ একটু হাঁ হয়েছিল। সেই হাঁ-করা মুখের ভেতর কালো কুচকুচে জিভ। বীণার দিকে এক পলক তাকাতেই বীণার বুক ধক করে উঠল। মনে হলো একটা পশু জিভ বের করে বসে আছে। তার নাকে ঝাঁঝালো গন্ধও এসে লাগল। গন্ধ ঐ লোকটার গা থেকে আসছিল। টক দুধ এবং পোড়া কাঠের গন্ধ একত্রে মেশালে যেরকম গন্ধ হয় সেরকম একটা গন্ধ। গা কেমন ঝিমঝিম করে।

লোকটা তাকে কোনো প্রশ্ন করল না। শুধু পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইল। বীণার একবার মনে হলো, লোকটার চোখে হয়তো পাতা নেই। সাপের যেমন চোখের পাতা থাকে না সেরকম। লোকটার সঙ্গে বয়স্ক যে দুজন মানুষ এসেছিলেন তাঁরা অনবরত কথা বলতে লাগলেন। একজন বীণাকে ডাকতে লাগলেন— আন্টি। চুল-দাড়ি পাকা বয়স্ক একজন লোক যদি আন্টি ডাকে তখন ভয়ংকর রাগ লাগে। কোনো কথারই জবাব দিতে ইচ্ছা করে না। বীণা অবিশ্যি সব প্রশ্নের জবাব দিল কারণ মামা তার পাশেই বসে আছেন। মামা বসেছেন সোফার ডানদিকে— সে বাঁদিকে। প্রশ্নের জবাব না দেয়ার কোনো উপায়ই নেই।

'তারপর আন্টি, রবি ঠাকুর কত সনে নোবেল পুরস্কার পান তা জানা আছে?'

'জী না।'

'উনিশশো তেরো। অবিশ্যি উনি উনিশশো তেরোতে না পেয়ে উনিশশো একত্রিশে পেলেও কিছু যেত আসত না। তবু তারিখটা জানা দরকার। এটা হচ্ছে জেনারেল নলেজ। মেয়েরা শুধু যে রান্নাবান্না করবে তা তো না— তাদের পৃথিবীতে কী হচ্ছে না-হচ্ছে তাও তো জানতে হবে। কী বলেন আন্টি?

'জী।'

'আন্টি, আপনি খবরের কাগজ পড়েন?'

'না।'

'এইটা হচ্ছে মেয়েদের একটা কমন দোষ। কোনো মেয়ে খবরের কাগজ পড়ে না। আপনি কেন খবরের কাগজ পড়েন না, না-পড়ার কারণটা কী আমাদের একটু বলুন তো আন্টি!'

www.BDeBooks.Com

বীণা কিছু বলল না। মামা পাশে বসে আছেন এই ভয়েই বলল না। কারণ মামা খবরের কাগজ রাখেন না বলেই সে খবরের কাগজ পড়ে না। এই তথ্যটা এঁদের জানানো নিশ্চয়ই ঠিক হবে না। মামা রাগ করবেন।

ইদরিস সাহেব বললেন, মা বীণা, ইনাদের চা মিষ্টি দাও।

পাঁচ জাতের মিষ্টি টেবিলে সাজানো। বীণা প্লেটে উঠিয়ে উঠিয়ে সবার দিকে এগিয়ে দিল। লোকটাকে যখন দিতে গেল তখন লোকটা অদ্ভুত একধরনের শব্দ করল। থাবার মতো বিশাল হাত বাড়িয়ে মিষ্টির থালা নিল। বীণা লক্ষ করল লোকটির আঙুলের নখ কালচে ধরনের। নখের মাথা পাখির নখের মতো ছুঁচালো। বীণার গা সত্যি সত্যি কাঁটা দিয়ে উঠল। সে মনে-মনে বলল, আল্লাহ এই লোকটা যেন আমাকে পছন্দ না করে। আল্লাহ এই লোকটা যেন আমাকে পছন্দ না করে।

লোকটা বীণাকে পছন্দ করল কি করল না কিছুই বোঝা গেল না। ইদরিস সাহেব এই প্রসঙ্গে বাসার কারোর সঙ্গেই কোনো আলাপ করলেন না। ইদরিস সাহেবের এই হলো স্বভাব। বাসার কারোর সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলবেন না। নিজে যা ভালো বুঝবেন তা-ই করবেন।

এই যে তিনি আজ বীণার কলেজে যাওয়া বন্ধ করলেন— এর কারণ তিনি কাউকে বলবেন না। ইদরিস সাহেবের জীবনের মূলমন্ত্র হচ্ছে নারীজাতির সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ না করা। নারীজাতির সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনার ফল একটাই— সময় নষ্ট। কী দরকার সময় নষ্ট করার ?

ইদরিস সাহেবের বাসায় তিনি ছাড়া সবাই মেয়ে। সব মিলিয়ে সাতজন মেয়ে। ইদরিস সাহেবের স্ত্রী, চার কন্যা, তাঁর এক ছোট বোন এবং কাজের একটি মেয়ে। তাঁর বাসায় দুটি বিড়াল থাকে। এই বিড়াল দুটিও মেয়ে-বিড়াল। সঙ্গত কারণেই ইদরিস সাহেব বাসায় যতক্ষণ থাকেন মনমরা হয়ে থাকেন। চারদিকে মেয়েজাতি নিয়ে বাস করতে তাঁর ভালো লাগে না। তিনি তাঁর ব্যবসা, তাঁর পরিকল্পনা কিছুই কাউকে বলেন না।

দিন পনেরো বীণার খুব ভয়ে-ভয়ে কাটল। কে জানে হয়তো লোকটা তাকে পছন্দ করে ফেলেছে। তার চেহারা এমন কিছু খারাপ না, পছন্দ করতেও পারে। রং মোটামুটি ফরসা। চোখ দুটো মায়া-মায়া, লম্বা হালকা-পাতলা শরীর। সাজলে তাকে ভালোই দেখায়। পছন্দ করে ফেললে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বীণা বেশ কয়েকবার লজ্জার মাথা খেয়ে তার মামিকে জিজ্ঞেস করেছে, মামি, মামা কি কিছু বলেছে ?

বীণার মামি হাসিনা পৃথিবীর সরলতম মহিলা। অতি সহজ কথাও তিনি বোঝেন না। একটু ঘুরিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করলে এমনভাবে তাকান যে মনে হয় অথৈ জলে পড়েছেন। বীণার সহজ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন— কিসের কথা রে ?

'ঐ যে শুক্রবারে যে আসল ?'

'কে আসল শুক্রবারে ?'

'তিনজন লোক আসল না ?'

'তিনজন লোক আবার কখন আসল ?'

'বিয়ের আলাপ নিয়ে আসল না ?'

'ও আচ্ছা— মনে পড়েছে। না, কিছু বলে নাই। তোর মামা কি কখনো কিছু বলে ? হাঠাৎ একদিন শুনবি বিয়ের দিন-তারিখ হয়ে গেছে। তোর মামা আগেভাগে কিছু বলবে ? কোনোদিন না।'

মাসখানিক কেটে যাবার পরেও বীণার ভয় কাটল না। মামা তাকে কোনো কারণে ডাকলেই মনে হতো এই বুঝি বলবেন, বীণা তোর বিয়ের তারিখ ঠিক করে ফেললাম। শ্রাবণ মাসের বার, মঙ্গলবার। তুই তোর বাবাকে চিঠি লিখে দে।

বীণা আতঙ্কে আতঙ্কেই ভয়াবহ কিছু দুঃস্বপ্নও দেখল। এই দুঃস্বপ্নগুলির প্রতিটিতে তার বিয়ে হয় সুন্দর একটা ছেলের সঙ্গে। বাসরঘরে সে আর ছেলেটা থাকে, আর সবাই চলে যায়। লজ্জায় সে মাথা নিচু করে থাকে। তখন তার স্বামী আদুরে গলায় বলে— লজ্জায় দেখি মরে যাচ্ছ! এই, তাকাও-না আমার দিকে। তাকাও। সে তাকায়। তাকাতেই তার গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়। মানুষ কোথায়, একটা কুকুরের মতো পশু থাবা গেড়ে বসে আছে। হাঁ-করা মুখের ভেতর কুচকুচে কালো একটা জিহ্বা। জিহ্বা মাঝে মাঝে মুখের ভেতর থেকে বের হয়ে আসছে। পশুটার নখ ছুঁচালো। তার গা থেকে টক দুধ আর পোড়া কাঠের গন্ধ ভেসে আসছে। স্বপ্নে মানুষ গন্ধ পায় না। কিন্তু বীণা এইজাতীয় স্বপ্নে গন্ধ পেত। তীব্র কটু গন্ধেই একসময় ঘুম ভেঙে যেত।

প্রায় দেড়মাস এরকম আতঙ্কে কাটল। তারপর আতঙ্ক হঠাৎ করেই কেটে গেল। কারণ ইদরিস সাহেব এক ছুটির দিনের দুপুরে ভাত খেতে খেতে বললেন, বিয়েটা ভেঙে দিলাম।

হাসিনা বললেন, কার বিয়ে ভেঙে দিলে ?

www.BDeBooks.Com

'বীণার। ঐ যে তিনজন এসেছিল শুক্রবারে। খুব চাপাচাপি করছিল। মেয়ে নাকি তাদের খুব পছন্দ। ওদের বাড়ির অবস্থা ভালো। গফরগাঁয়ে কাপড়ের ব্যবসা আছে। গ্রামের বাড়িতে ধান ভাঙার কল দিয়েছে। বড় বড় আত্মীয়-স্বজন।'

'তাহলে বিয়ে ভেঙে দিলে কেন ?'

'ছেলের গায়ে বিশ্রী গন্ধ। ঘোড়ার আস্তাবলে গেলে যেমন গন্ধ পাওয়া যায় সেইরকম। যে-ক'বার এই ছেলে আমার কাছে এসেছে এরকম গন্ধ পেয়েছি। কী দরকার ?

হাসিনা দুঃখিত মুখ করে বললেন, আহা গন্ধের জন্যে বিয়েটা বাতিল করে দিলে! ভালোমতো সাবান দিয়ে গোসল দিলেই তো গন্ধ চলে যায়।

ইদরিস কড়া গলায় বললেন, যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বলবে না। তুমি রোজ গিয়ে গোসল করিয়ে আসবে নাকি ? মেয়েছেলে মেয়েছেলের মতো থাকবে। সবকিছুর মধ্যে কথা বলবে না।

'রাগ করছ কেন ? রাগ করার মতো কী বললাম ?'

'চুপ। আর একটা কথাও না।'

ইদরিস সাহেবের দুর্ব্যবহারে হাসিনা কাঁদতে বসেন, তবে বীণার আনন্দের সীমা থাকে না। যাক শেষ পর্যন্ত লোকটির সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে না। মামার প্রতি কৃতজ্ঞতায় বীণার মন ভরে যায়। মামা কথা না বললেও মানুষ খারাপ না। কে জানে এই যে তাকে কলেজে যেতে নিষেধ করেছেন এরও কোনো ভালো দিক নিশ্চয়ই আছে। মামা যদি শুধু কারণটা বলতেন! কিন্তু মামা বলবেন না। অদ্ভুত মানুষ।

নিতান্তই আকস্মিকভাবে বীণা তার কলেজ বন্ধ হবার রহস্য জেনে ফেলল। ইদরিস সাহেব বীণার বাবাকে চিঠিতে কারণটা জানিয়েছেন। খামে ভরার আগে এই চিঠি বীণা পড়ে ফেলল।

পাকজনাবেষু

দুলাভাই,

আমার সালাম জানিবেন। পর সমাচার এই যে, বীণার কলেজ যাওয়া একটি বিশেষ কারণে বন্ধ করিতে হইয়াছে। বীণা ইহাতে কিঞ্চিৎ মনে কষ্ট পাইয়াছে। কিন্তু ইহা ছাড়া অন্য উপায় দেখিলাম না। এখন আপনাকে কারণ বলিতেছি। জোবেদ আলি নামক গফরগাঁয়ের জনৈক যুবকের সহিত বীণার বিবাহের আলাপ হইয়াছিল। পাত্রপক্ষের, বিশেষ করিয়া পাত্রের বীণাকে খুবই পছন্দ হইয়াছিল। একটি বিশেষ

কারণে বিবাহের প্রস্তাব বাতিল করিয়া দিতে হইয়াছে। এখন কিছুটা সমস্যা দেখা দিয়াছে। উক্ত জোবেদ আলি প্রায়শই বীণাকে অনুসরণ করিয়া কলেজ পর্যন্ত যায়। ইহা আমার কাছে অত্যন্ত সন্দেহজনক বলিয়া মনে হইল। আজকালকার ছেলেদের মতিগতির কোনো ঠিক নাই। একবার যদি অ্যাসিডজাতীয় কিছু দেয় তাহা হইলে সর্বনাশের কোনো শেষ থাকিবে না। যাহা হউক আপনি তাহার বি.এ. পরীক্ষা নিয়া কোনো চিন্তা করিবেন না। আমি কলেজে প্রিন্সিপালের সহিত আলাপ করিয়াছি। তিনিও বলিয়াছেন কোনো অসুবিধা হইবে না। আগেকার মতো কলেজগুলি পার্সেন্টেজ নিয়া ঝামেলা করে না। আপনার শরীরের হাল-অবস্থা এখন কী ? শরীরের যত্ন নিবেন। বীণাকে লইয়া অযথা চিন্তাগ্রস্ত হইবেন না।'

চিঠি পড়ে বীণার গা কাঁপতে লাগল। কী সর্বনাশের কথা, ঐ লোক তার পেছনে পেছনে যায়। কই সে তো একদিনও টের পায়নি! আর তার মামার কি উচিত ছিল না ঘটনাটা তাকে জানানো ? সে এখন কলেজে যাচ্ছে না ঠিকই কিন্তু অন্য জায়গায় তো যাচ্ছে। আগে জানলে তাও যেত না। ঘরে বসে থাকত। অবশ্যই মামার উচিত ছিল ঘটনাটা তাকে জানানো।

বীণাকে খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে বলা ঠিক হবে না। সে যদি বুদ্ধিমতী মেয়ে হতো তাহলে চট করে বুঝে ফেলত তাকে ঘটনাটা জানানোর জন্যেই ইদরিস সাহেব খামে ভরার আগে চিঠিটা দীর্ঘ সময় টেবিলে ফেলে রেখেছিলেন। এইজাতীয় ভুল তিনি কখনো করেন না।

বীণা বাড়ি থেকে বের হওয়া পুরোপুরি বন্ধ করে দিল। আগের ভয়ের স্বপ্নগুলি আবার দেখতে লাগল। এবারের স্বপ্নে আরো সব কুৎসিত ব্যাপার ঘটতে লাগল। এমন হলো যে, ঘুমুতে পর্যন্ত ভয় লাগে।

হাসিনা বলেন, কী হয়েছে তোর বল তো ?

বীণা ফ্যাকাশে হাসি হেসে বলে, কই কিছু হয়নি তো ?

'তুই তো শুকিয়ে চটিজুতা হয়ে যাচ্ছিস! তোর তো আর বিয়েই হবে না। এরকম শুকনো মেয়েকে কে বিয়ে করবে বল ? গায়ে গোশত না থাকলে ছেলেরা মেয়েদের পছন্দ করে না। ছেলেগুলি হচ্ছে বদের বদ। ঝাঁটা মার এদের মুখে।'

বীণার বন্দিজীবন কাটতে লাগল। মেয়েরা যে-কোনো পরিস্থিতিতে নিজেদের খুব সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। বীণাও খাপ খাইয়ে নিল।

www.BDeBooks.Com

সারাদিন তিন কামরার ঘরেই সময় কাটে। বাইরের বারান্দায় ভুলেও যায় না। বাইরের বারান্দায় দাঁড়ালে রাস্তার অনেকটা চোখে পড়ে। তার ভয় বারান্দায় দাঁড়ালে যদি লোকটাকে দেখে ফেলে। এত সাবধানতার পরেও একদিন দেখা হয়ে গেল। বারান্দায় কাপড় শুকাতে দেয়া হয়েছে। হাসিনা বললেন, বৃষ্টি এসেছে, কাপড়গুলি নিয়ে আয় তো বীণা! বীণা কাপড় আনতে গিয়ে পাথরের মতো জমে গেল। বাড়ির সামনের রাস্তাটার অপর পাশে জারুল গাছের নিচে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে বীণার দিকে। মুখ হাঁ হয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে খানিকটা কুঁজো হয়ে। বীণাকে দেখেই সে দ্রুত রাস্তা পার হয়ে এ-পাশে চলে এল। হাত-ইশারা করে কী যেন বলল। বীণা চিৎকার করে ঘরে ঢুকল। ঘণ্টাখানিকের মধ্যে তার জ্বর উঠে গেল একশো তিন।

হাসিনা বললেন, এটা কেমন কথা! লোকটা তো বাঘও না ভালুকও না। তাকে দেখে এত ভয় পাওয়ার কী আছে ?

বীণা বিড়বিড় করে বলল, আমি জানি না মামি। কেন এত ভয় লাগছে আমি জানি না। আপনি আমাকে ধরে বসে থাকেন। কেমন যেন লাগছে মামি।

ইদরিস সাহেব সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে সব শুনলেন। কাউকে কিছুই বললেন না। সহজ ভঙ্গিতে খাওয়াদাওয়া করলেন। বড় মেয়েকে অংক দেখিয়ে দিলেন। রাত সাড়ে নটার সময় বললেন, একটা সুটকেসে বীণার কাপড় গুছিয়ে দাও তো! রাত এগারোটায় বাহাদুরাবাদ এক্সপ্রেস। বীণাকে দেশের বাড়িতে রেখে আসি।

হাসিনা হতভম্ভ হয়ে বললেন, আজ রাতে ?

ইদরিস সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, আজ রাতে নয় তো কি পরশু রাতে নাকি ? জোবেদ হারামজাদা বড় বিরক্ত করছে। আমি আরো কয়েকদিন দেখেছি।

'আজ রাতে যাওয়ার দরকার কী, কাল যাও।'

'কাল যেতে পারলে আজ যেতে অসুবিধা কী ? তোমরা মেয়েমানুষরা যা বোঝ না শুধু সেটা নিয়ে কথা বল। কাপড় গুছিয়ে দিতে বলেছি গুছিয়ে দাও।'

'বীণার জ্বর।'

'জ্বরের সঙ্গে কাপড় গোছানোর সম্পর্ক কী ? কাপড় তো তুমি গোছাবে। তোমার গায়ে তো জ্বর নেই।'

হাসিনা কাপড় গুছিয়ে দিলেন। তাঁর স্বামীকে তিনি চেনেন। কথাবার্তা বলে লাভ হবে না। বীণা একশো দুই পয়েন্ট পাঁচ জ্বর নিয়ে বাহাদুরাবাদ এক্সপ্রেসে উঠল। বাড়িতে পৌঁছাতে সেই জ্বর বেড়ে গেল একশো চার পয়েন্ট পাঁচ।

ইদরিস সাহেব ছুটি নিয়ে যাননি। বীণাকে রেখে পরদিনই তাঁকে চলে আসতে হলো। বীণা সপ্তাহখানিক জ্বরে ভুগে কংকালের মতো হয়ে গেল। মুখে রুচি নেই। যা খায় তা-ই বমি করে ফেলে দেয়। রাতে ঘুম হয় না। প্রায় রাতই জেগে জেগে কাটিয়ে দেয়। চোখের পাতা এক হলেই ভয়ংকর সব স্বপ্ন দেখে।

এই সময় তার ভয়ের অসুখ হয়। সারাক্ষণই ভয় লাগে। কোনো কারণ ছাড়াই অস্বাভাবিক ভয়। কেউ হয়তো সামনে দিয়ে গেল অমনি বীণার বুক ধড়াস করে ওঠে। বাতাসে জানালার পাট নড়ে উঠলে বীণার হৃৎপিণ্ড লাফাতে শুরু করে, সে আতঙ্কে অস্থির হয়ে যায়। প্রচণ্ড ঘাম হয়।

বীণাদের এই বসতবাড়িটা খুবই পুরনো। বীণার দাদা এক হিন্দু ব্যবসায়ীর কাছ থেকে খুব সস্তায় এই বাড়ি কিনে নিয়েছিলেন। অনেকখানি জায়গা নিয়ে বাড়ি। পুরো জায়গাটা দেয়াল দিয়ে ঘেরা। সংস্কারের অভাবে দেয়াল জায়গায় জায়গায় ভেঙে পড়েছে। দোতলার ঘরের বেশির ভাগই ব্যবহারের উপযোগী নয়। একতলার তিনটা ঘর শুধু ব্যবহার হয়। দোতলার ঘর তালাবদ্ধ থাকে।

একটা ঘরে বীণার বাবা এমদাদ সাহেব থাকেন। প্যারালাইসিসের কারণে এই ঘর থেকে বের হবার তাঁর কোনো উপায় নেই। অন্য একটা ঘরে বীণা এবং বীণার দূর-সম্পর্কের মামি মরিয়ম থাকেন। ঘরের কাজকর্ম করার জন্যে বাতাসী নামের কমবয়েসী একটা মেয়ে থাকে। তার চোখের অসুখ আছে। রাতে সে কিছুই দেখে না।

বাড়িতে মানুষ বলতে এই চারটি প্রাণী। সন্ধ্যার পর থেকেই বীণার ভয়-ভয় করে। দোতলার বারান্দায় কিসের যেন শব্দ হয়। মনে হয় খড়ম পরে কেউ যেন হাঁটে। বীণা জানে ইঁদুর শব্দ করছে। তবু তার ভয় কাটে না। দুর্বল নার্ভের কারণেই হয়তো আতঙ্কে তার শরীর কাঁপতে থাকে। সে ফিসফিস করে বলে— কিসের শব্দ মামি ?

মামি ঘরের কাজ করতে করতে নির্বিকার গলায় বলেন, জানি না।

'মনে হয় ইঁদুরের শব্দ, তা-ই না মামি ?

'হইতেও পারে। আবার অন্যকিছুও হইতে পারে।'

www.BDeBooks.Com

'অন্যকিছু কী ?'

'সইন্ধ্যাবেলায় এরার নাম নেওন নাই মা। খারাপ বাতাস হইতে পারে।'

'খারাপ বাতাস ?'

'কতদিনের পুরনো বাড়ি। উপরের ঘরগুলান খালি পইড়া থাকে। কেউ বাত্তি দেয়া না। ঘরে বাত্তি না দিলে খারাপ বাতাসের আনাগোনা হয়।'

'বাতি দেন না কেন ? বাতি দিলেই তো হয়। কাল থেকে রোজ সন্ধ্যায় বাতি দেবেন মামি।'

'আচ্ছা দিমুনে। অখন ঘুমাও।'

বীণা শুয়ে থাকে। ঘুম আসে না। রাত যতই বাড়তে থাকে দোতলার শব্দ ততই বাড়তে থাকে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয় বীণার বাবার গোঙানি। গভীর রাতে তিনি হাঁটুর ব্যথায় গোঙ্গানির মতো শব্দ করেন। সেই শব্দ বীণার কানে অমানুষিক শব্দ বলে মনে হয়। যেন বীণার বাবা নয়, অন্য কেউ শব্দ করছে। সেই অন্য কেউ মানুষগোত্রীয় নয়। একধরনের চাপা হাসিও শোনা যায়।

বীণাদের স্নানঘর মূল ঘর থেকে অনেকটা দূরে। স্নানঘর বীণার খুব প্রিয়। শ্যাওলা-ধরা। দেয়ালঘেরা ছোট্ট চারকোণা একটা জায়গা। ভেতরে চৌবাচ্চা আছে। স্নানঘরের ছাদটা ছিল টিনের। গত আশ্বিন মাসের ঝড়ে টিনের ছাদ উড়ে গেছে। সেই ছাদ আর ঠিক করা হয়নি। গোসলের সময় মাথার উপর থাকে খোলা আকাশ। ঠিক দুপুরবেলায় সূর্যের ছায়া পড়ে চৌবাচ্চার পানিতে। মগ ডোবালেই চৌবাচ্চা থেকে আলো ঠিকরে পড়ে চারদিকের সবুজ দেয়ালে। বীণার বড় ভালো লাগে। দুপুরবেলা বীণার অনেকখানি সময় এই গোসলখানায় কেটে যায়। রোজই মনে হয় গ্রামের বাড়িতে এসে ভালোই হয়েছে। রাতের তীব্র আতঙ্কের কথা তখন আর মনে থাকে না।

এক দুপুরবেলায় এই গোসলখানাতেই অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার ঘটল। বীণা গোসল করছে। চারদিকে সুনসান নীরবতা। ঘন নীল আকাশের ছায়া পড়েছে চৌবাচ্চায়। বীণার চমৎকার লাগছে। শরীরটা আগের মতো দুর্বল লাগছে না। সে আপনমনে খানিকক্ষণ গুনগুন করল।

বীণা মাথায় পানি ঢালল। ঠাণ্ডা পানি। শরীর কেঁপে উঠল। আর তখনই সে অদ্ভুত একটা গন্ধ পেল। অদ্ভুত হলেও গন্ধ চেনা, এই গন্ধ সে আগেও পেয়েছে। বীণা আতঙ্কে অভিভূত হয়ে পড়ল। নির্জন গোসলখানায়

এই গন্ধ এল কোথেকে ? গুঁড়া কাঠকয়লার সঙ্গে মেশানো নষ্ট দুধের মিশ্র গন্ধ। বীণা মগ ছুড়ে ফেলে গোসলখানার দরজায় আছড়ে পড়ল। দরজা খুলে দৌড়ে পালিয়ে যেতে হবে। আর এক মুহূর্ত এখানে থাকা যাবে না। এক মুহূর্তও না।

আশ্চর্যের ব্যাপার! বীণা দরজা খুলতে পারল না। ছিটকিনি নামানো হয়েছে। বীণা প্রাণপণে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে অথচ দরজা একচুলও নড়ছে না। যেন কেউ তাকে আটকে ফেলেছে। বীণা চিৎকার করবার চেষ্ট করল, গলা দিয়ে শব্দ বেরুল না। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল। দরজা তো নড়লই না, কোনো শব্দ পর্যন্ত হলো না। অথচ ঘরে অন্য একরকম শব্দ হচ্ছে। যেন কী-একটা পড়ছে চৌবাচ্চায়। টুপটাপ শব্দ। বৃষ্টির ফোঁটার মতো।

'কী পড়ছে ?'

'কিসের শব্দ হচ্ছে ?'

বীণা হতভম্ব হয়ে দেখল টকটকে লালবর্ণের রক্ত পড়ছে চৌবাচ্চায়। চৌবাচ্চার পানি ক্রমেই ঘোলা হয়ে উঠছে। কেউ-একজন খোলা ছাদে বসে আছে। রক্ত পড়ছে তার পা থেকে।

বীণা সেই দৃশ্য দেখতে চায় না। সে কিছুতেই উপরের দিকে তাকাবে না। সে জানে উপরের দিকে তাকালেই ভয়ংকর কিছু দেখবে। এমন ভয়ংকর কিছু যা ব্যাখ্যার অতীত, অভিজ্ঞতার অতীত।

কে যেন একজন খোলা ছাদে বসে আছে। রক্ত পড়ছে তার পা থেকে। ভারী, শ্লেষ্মাজড়িত স্বরে ডাকল— বীণা, ও বীণা। শব্দ উপর থেকে আসছে। কেউ একজন বসে আছে গোসলখানার দেয়ালে। যে বসে আছে তাকে বীণা চেনে। না-দেখেও বীণা বলতে পারছে কে বসে আছে।

'ও বীণা। বীণা।

বীণা তাকাল। হ্যাঁ, ঐ লোকটিই বসে আছে। তবে লোকটির মুখ পশুর মতো নয়। মায়ামাখা একটি মুখ। বড় বড় চোখ দুটি বিষণ্ন ও কালো। লোকটি পা ঝুলিয়ে বসে আছে। পা দুটি অস্বাভাবিক— থ্যাঁতলানো। চাপচাপ রক্ত সেই থ্যাঁতলানো পা বেয়ে চৌবাচ্চার জলে পড়ছে। লোকটি ভারী শ্লেষ্মাজড়িত স্বরে ডাকল— বীণা, ও বীণা।

বীণা জ্ঞান হারাল।

তার জ্ঞান ফিরল তৃতীয় দিনে জামালপুর সদর হাসপাতালে। চোখ মেলে দেখল আরো অনেকের সঙ্গে বিছানার পাশে ইদরিস সাহেব বসে

www.BDeBooks.Com

আছেন। তাঁকে টেলিগ্রাম করে আনানো হয়েছে। ইদরিস সাহেব গভীর মমতার সঙ্গে বললেন, কী হয়েছে রে মা ?

বীণা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, ভয় পেয়েছি মামা।

ইদরিস সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, ভয় পাবারই কথা। ঐ জংলা বাড়িতে আমি নিজেই ভয় পাই আর তুই পাবি না ? এখানে থাকার দরকার নেই, চল আমার সঙ্গে ঢাকায়। ঢাকায় গিয়ে আবার কলেজে যাওয়া-আসা শুরু কর। ঐ ছেলে আর তোকে বিরক্ত করবে না। বেচারা ট্রাক অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে।

বীণা চোখ বন্ধ করে ফেলল।

ইদরিস সাহেব নিজের মনেই বললেন, পায়ের উপর দিয়ে ট্রাক চলে গেছিল। দুটা পা-ই ছাতু হয়ে গেছে। হাসপাতালে নেয়ার আঠারো ঘণ্টা পরে মারা গেছে। খবর পেয়ে দেখতে গিয়েছিলাম। না গেলে অভদ্রতা হয়।

ইদরিস সাহেব খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললেন, ছেলেটা খারাপ ছিল না, বুঝলি। খামোখাই আজেবাজে সন্দেহ করেছি। অতি ভদ্র ছেলে। তোর কথা জিজ্ঞেস করল। বেশ কয়েকবার জিজ্ঞেস করল।

বীণার ইচ্ছা করল বলতে— আমার কথা কি জিজ্ঞেস করল মামা ? সে বলতে পারল না।

ইদরিস সাহেব বললেন, ছেলেটার অ্যাকসিডেন্টের খবর তার অঞ্চলে পৌঁছামাত্র সেখানের সব লোক এসে উপস্থিত। হাজার হাজার মানুষ। হাউমাউ করে কাঁদছে। দেখবার মতো একটা দৃশ্য! বুঝলি বীণা, আমরা মানুষের বাইরেরটাই শুধু দেখি। অন্তর দেখি না। এটা খুবই আফসোসের ব্যাপার। তোর যাতে ভালো বিয়ে হয় এইজন্যে আমাকে কিছু টাকাও দিয়ে গেছে। না করতে পারলাম না। একটা মানুষ মারা যাচ্ছে কী করে 'না' বলি! ঠিক না ?

কুকুর

'কেমন আছেন প্রফেসর সাহেব ?'

আমি মনের বিরক্তি গোপন করার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে বললাম, জী ভালো আছি।

ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন, বসব খানিকক্ষণ ?

'জী বসুন। আমি অবশ্যি কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরুব।'

'আমাকে কি চিনতে পারছেন ?'

'জী না।'

'ঐ যে মোড়ের সিগারেটের দোকানের সামনে আলাপ হলো। আপনি সিগারেট কিনছিলেন, আমি পান।'

আমি ভদ্রলোককে চিনতে পারলাম না। মোড়ের পানের দোকানে সামান্য আলাপের পর সারাজীবন চিনে রাখব আমার স্মৃতিশক্তি এত ভালো নয়। ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন, আমার নাম আলিমুজ্জামান। পোস্টাল সার্ভিসে ছিলাম, তিন বছর আগে রিটায়ার করেছি। এইটথ মে মঙ্গলবার। এখন ঘরেই থাকি, একটা বাগান করেছি।

'ভালো, খুবই ভালো।'

ভদ্রলোক সোফায় বসেছেন। কৌতূহলী চোখে চারদিক দেখছেন। বারবার আমার বইয়ের আলমিরায় তাঁর চোখ আটকে যাচ্ছে। আমি শঙ্কিত বোধ করছি। এখনই হয়তো বলবেন, আপনার তো অনেক বই, কয়েকটা নিয়ে যাই। পড়ে ফেরত দেব।

www.BDeBooks.Com

আমি এখন পর্যন্ত কাউকে দেখিনি যে বই পড়ে ফেরত দেয়। ইনিও দেবেন তা মনে হয় না। বই নেয়ার ছুতায় রোজ এসে বিরক্ত করবেন। আমি এমন কোনো মিশুক লোক না যে এই বুড়োমানুষটির সঙ্গ পছন্দ করব।

'প্রফেসর সাহেব, আপনি কি ভূত-প্রেত এইসব বিশ্বাস করেন ?'

'জী না, করি না।'

'শুনে ভালো লাগল। আজকাল শিক্ষিত লোক দেখি এইসব বিশ্বাস করে। মনটা খারাপ হয়। মানুষ চাঁদে যাচ্ছে সেটা বিশ্বাস করছে আবার ভূতও বিশ্বাস করছে। ফিজিক্সের এক প্রফেসরের হাতে দেখেছি চারটা পাথরের আংটি।'

আমি চুপ করে রইলাম। আমার কাছ থেকে উত্তর না পেলে ভদ্রলোকের আলাপের উৎসাহ হয়তো কমে যাবে। তিনি বিদায় হবেন।

'প্রফেসর সাহেব!'

'জী।'

'আপনি কি কো-ইনসিডেন্সে বিশ্বাস করেন ?'

'আপনার প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'কাকতালীয় ঘটনা।'

'আমি এখনও আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পারছি না।'

'আরেকদিন আপনাকে বলব, আজ মনে হচ্ছে আপনি একটু বিরক্ত। তবে ঘটনাটা বলা শুরু করলে আপনার বিরক্তি কেটে যেত।'

আমি ভদ্রলোকের কথায় সত্যিকার অর্থেই লজ্জিত বোধ করলাম। আমি বিরক্ত নিশ্চয়ই হয়েছি, কিন্তু সেই বিরক্তি উনি ধরে ফেলবেন তা বুঝতে পারিনি। রিটায়ার্ড মানুষ। একা একা থাকেন। কথা বলার সঙ্গী তো তাঁদেরই দরকার।

'প্রফেসর সাহেব উঠি।'

'উঠবেন ?'

'জী। আজকাল কোথাও বেশিক্ষণ বসি না। রিটায়ার্ড মানুষদের কেউ পছন্দ করে না। সবাই ভাবে সময় নষ্ট করার জন্যে গিয়েছি। তা ছাড়া মানুষদের সঙ্গ আমি নিজেও যে খুব পছন্দ করি তা না।'

'আপনি আসবেন, আপনার সঙ্গে গল্প করব। কোনো অসুবিধা নেই। আজ অবশ্যি একটু ব্যস্ত।'

'গল্পগুজব আমি তেমন পারি না। কো-ইনসিডেন্সের একটা ব্যাপার আমার জীবনে আছে— ঐ গল্পটা ছাড়া আমি কোনো গল্প জানি না। গল্পটা খুব ব্যক্তিগত, এই জীবনে অল্প কয়েকজনকে বলেছি। আপনাকে কেন জানি বলার ইচ্ছা করছিল।'

'অবশ্যই বলবেন।'

'আপনি যদি দয়া করে একটু বারান্দায় আসেন তাহলে আমার বাসাটা আপনাকে দেখাতাম, হঠাৎ কোনো একদিন চলে এলে ভালো লাগত!'

আমি বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। ভদ্রলোক হাত উঁচু করে দেয়াল দিয়ে ঘেরা একতলা একটি বাড়ি দেখালেন। পুরনো বাড়ি। দোতলার কাজ শুরু করা হয়েছিল শেষ হয়নি। বাড়ির সামনে দুটা জড়াজড়ি কাঁঠাল গাছ।

'একদিন যদি আসেন আপনার ভালো লাগবে। আমার জীবনের কো-ইনসিডেন্সের ঘটনাটাও শুনবেন।'

'জী আচ্ছা একদিন যাব।'

'আমার নামটা আপনার মনে আছে তো ?'

'জী আছে।'

'নামটা বলুন তো!'

আমি দ্বিতীয়বার লজ্জা পেলাম। কারণ ভদ্রলোকের নাম কিছুতেই মনে করতে পারলাম না।

ভদ্রলোকের স্বভাবও এমন বিচিত্র যে আমার লজ্জা বুঝতে পেরেও জবাবের জন্যে মাথা নিচু করে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

'নামটা বোধহয় আপনার মনে পড়ছে না তা-ই না ?'

'জী না।'

'মনে থাকার কথাও না। আনকমন নাম মানুষের মনে থাকে। আমার নাম খুবই কমন— আলিমুজ্জামান। একদিন আসবেন আমার বাসায় দয়া করে। ঘটনাটা বলব, শুনতে আপনার খারাপ লাগবে না।'

'জী আচ্ছা, আমি যাব। খুব শিগ্‌গিরই একদিন যাব।'

এক বৃহস্পতিবার বিকেলে ভদ্রলোকের বাসায় উপস্থিত হলাম। গল্প শোনার আগ্রহে নয়, লজ্জা কাটানোর জন্যে। ভদ্রলোক ঐদিন আমাকে খুব লজ্জায় ফেলেছিলেন।

বাসায় ঢুকে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। সাধারণ একটা বসার ঘর। বেতের কয়েকটা চেয়ার। দেয়ালজুড়ে বইয়ের আলমিরা। খুব কম

www.BDeBooks.Com

করে হলেও হাজার পনেরো বই ভদ্রলোকের সংগ্রহে আছে। কারো ব্যক্তিগত সংগ্রহে এত বই থাকে আমার জানা ছিল না। নিজের অজান্তেই আমি বললাম— অপূর্ব!

ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন— বলেছিলাম না আমার বাসায় এলে আপনার ভালো লাগবে।

'আপনার বইয়ের সংখ্যা কত ?'

'ষোলো হাজারের কিছু বেশি। আমার শোবার ঘরেও বেশকিছু বই। আপনাকে দেখাব।'

'সব আপনার নিজের সংগ্রহ ?

'আমার বাবার সংগ্রহ অনেক আছে। বই কেনার বাতিক বাবার কাছ থেকে পেয়েছি। খুব বইপাগল লোক ছিলেন। খুব বই পড়তেন। আমি তাঁর মতো পড়তে পারি না। অনেক বই আছে, আমি কিনে রেখেছি, এখনও পড়িনি।'

'এখন তো প্রচুর অবসর। এখন নিশ্চয় পড়ছেন।'

'আমার চোখের সমস্যা আছে। খুব বেশিক্ষণ একনাগাড়ে পড়তে পারি না। আমি খুব খুশি হব যদি আমার লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে আপনি পড়েন। বই তো পড়ার জন্যেই। আলমিরায় সাজিয়ে রাখার জন্যে না।'

'আপনি কি সবাইকে বই পড়তে দেন ?'

'জী দিই।'

'তারা বই ফেরত দেয় ?'

'অনেকেই দেয় না। সেইসব পরে কিনে ফেলি। আমার সংসার ছোট। একটামাত্র মেয়ে, স্ত্রী মারা গেছেন। সংসারের তুলনায় টাকা-পয়সা ভালোই আছে। বই কেনায় একটা অংশ ব্যয় করি। আপনি ঘুরে ঘুরে বই দেখুন, আমি চা নিয়ে আসছি।'

'চা লাগবে না।'

'কেন লাগবে না ? চা খেতে খেতে গল্প করব। আমার ঘটনাটা আপনাকে বলব। আপনাকে বলার জন্যে আমি একধরনের আগ্রহ অনুভব করছি।

'কেন বলুন তো ?'

'আপনি বিজ্ঞানের মানুষ। আপনি শুনলে একটা ব্যাখ্যা হয়তো দাঁড় করাতে পারবেন। অবিশ্যি ব্যাখ্যার জন্যে আমি খুব ব্যস্তও না। প্রতিটি

বিষয়ের পেছনে একটা কার্যকারণ যে থাকতেই হবে এমন তো কোনো কথা নেই। আমরা কোত্থেকে এসেছি, আমরা কোথায় যাচ্ছি— এই বিষয়গুলোর তো এখনও মীমাংসা হয়নি, কী বলেন প্রফেসর সাহেব...

অন্য সময় হলে এই ভদ্রলোকের কথায় আমি তেমন কোনো গুরুত্ব দিতাম না। কিন্তু যাঁর বাড়িতে বইয়ের সংখ্যা ষোলো হাজার তাঁর কথা মন দিয়ে শুনতে হয়। তাঁর তুচ্ছতম কথাও আগ্রাহ্য করা যায় না।

ভদ্রলোকের গল্প সেই কারণেই অতি অগ্রহ নিয়ে শুনলাম। যেভাবে শুনেছি ঠিক সেইভাবে বলার চেষ্টা করছি। ভদ্রলোক গল্পের মাঝামাঝি পর্যায়ে এসে ইংরেজিতে বলা শুরু করেছেন। আমি তা করছি না। কোনোরকম ব্যাখ্যা বা টীকা-টিপ্পনীও দিচ্ছি না। পুরোটা পাঠকদের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি।

'ভাই ঘটনাটা তা হলে বলা শুরু করি।

কিছু-কিছু মানুষ আছে পশুপ্রেমিক। কুকুর-বেড়াল, গরু-ভেড়া এইসব জন্তুর প্রতি তাদের অসাধারণ মমতা। রাস্তায় একজন ভিখিরি চিৎকার করে কাঁদলে সে ভিখিরির কাছে এগিয়ে যাবে না, কিন্তু একটা বিড়াল কুঁইকুঁই করে কাঁদলে ছুটে যাবে, বিড়ালটাকে পানি খাওয়াবে।

আপনাকে শুরুতেই বলে রাখি, আমি এরকম কোনো পশুপ্রেমিক না। কুকুর বেড়াল এইসব আমার অপছন্দের প্রাণী। একটা গরু বা ভেড়ার গায়ে আমি হাত দিতে পারি কিন্তু কুকুর বা বেড়ালের গায়ে হাত দিতে আমার ঘেন্না লাগে। তা ছাড়া ডিপথেরিয়া, জলাতঙ্ক এইসব অসুখ এদের মাধ্যমে ছড়ায় এটাও আমি সবসময় মনে রাখি।

যা-ই হোক, মূল গল্পে ফিরে যাই। আমি তখন ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। শীতকাল। কলেজে প্র্যাকটিক্যাল শেষ করে বাসায় ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। তখন পড়ি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে। আমাদের বাসা ঠাকুরপাড়ায়।

একদিন বাসায় ফিরছি। দিনটা মনে আছে, বুধবার। সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে। গায়ে গরম কাপড় ছিল না। প্রচণ্ড শীত লাগছে। বাসার কাছাকাছি এসে দেখি পাড়ার তিন-চারটা ছেলে কাগজ, শুকনো কাঠ এইসব জড়ো করে আগুন করছে। আমাদের সামনের বাসার নান্টুকেও দেখা গেল। মহা ত্যাঁদড় ছেলে। তার হাতে একটা কুকুরছানা। ছানাটার গায়ে কাপড় জড়ানো— শুধু মুখ বের হয়ে আছে। কুকুরছানা আরামে কুঁইকুঁই করছে।

আমি বললাম, কী হচ্ছে রে নান্টু ?

www.BDeBooks.Com

নান্টু দাঁত বের করে হাসল। অন্য একজন বলল, নান্টু কুকুরকে কম্বল পরিয়েছে। শীত লাগে তো এইজন্যে। দলের বাকি সবাই হোহো করে হেসে উঠল। ছেলেগুলির বয়স দশ থেকে এগারোর মধ্যে। এই বয়সের বালকরা সবসময় খুব আনন্দে থাকে। নানা জায়গা থেকে আনন্দের উপকরণ সংগ্রহ করে। কুকুরকে কাপড় দিয়ে মোড়া হয়েছে এতেই তাদের আনন্দের সীমা নেই।

মানুষের সাধারণ প্রবৃত্তি হচ্ছে আনন্দে অংশগ্রহণ করা। আমি ওদের দিকে এগিয়ে গেলাম। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম আমার এগিয়ে যাওয়াটা কেউ তেমন পছন্দ করছে না। মুখ-চাওয়াচাওয়ি করছে। হয়তো তারা চায় না ছোটদের খেলায় বড়রা অংশগ্রহণ করুক। নান্টুকে খুবই বিরক্ত মনে হলো।

ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়ানোমাত্র কেরোসিনের গন্ধ পেলাম। হয়তো বাসা থেকে কেরোসিন এনে কেরোসিন ঢেলে আগুন করেছে। বালকরা কায়দাকানুন করতে খুব ভালোবাসে।

'কেরোসিন দিয়েছিস নাকি ?'

কেউ কোনো জবাব দিল না। নান্টুর মুখ কঠিন হয়ে গেল। আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না। নান্টু বলল, আপনি চলে যান। তার গলা কঠিন। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। তাকিয়ে দেখি নান্টুর কোলের কুকুরছানা ভিজে চুপচুপ করছে। বুকটা ধক করে উঠল। এরা ছানাটার গায়ের কাপড় কেরোসিন দিয়ে চুবিয়েছে নাকি ? নতুন কোনো খেলা ? একে আগুনে ছেড়ে দেবে না তো ? শিশুরা মাঝে মাঝে নিষ্ঠুর খেলায় মেতে ওঠে। আমি কড়া গলায় বললাম, এই নান্টু, তুই কুকুরটার গায়ে কেরোসিন ঢেলেছিস ?

নান্টু কঠিন মুখে বলল, তাতে আপনার কী ?

'কেন কেরোসিন ঢালবি ?'

নান্টু কিছু বলল না। অন্য একজন বলল, কুকুরটা আগুনের মধ্যে ছাড়বে। এর গলায় ঘুঙুর বাঁধা আছে। আগুনে ছাড়লে এর গায়ে আগুন লাগবে আর সে দৌড়াবে। ঘুঙুর বাজবে। যত তাড়াতাড়ি দৌড়াবে তত তাড়াতাড়ি ঘুঙুর বাজবে। এইটাই মজা।

আমি হতভম্ব, এরা বলে কী! ছেলেটার কথা শেষ হবার আগেই নান্টু কুকুর-ছানাটা আগুনে ফেলে দিল। দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। কুকুরছানা দৌড়াল না, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। হয়তোবা মানুষের নিষ্ঠুরতায় হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।

আমি আগুনের উপর লাফিয়ে পড়লাম। আমার শার্টে আগুন ধরে গেল। প্যান্টে আগুন ধরে গেল। এইসব কিছুই গ্রাহ্য করলাম না। আমার একমাত্র চিন্তা বাচ্চাটাকে আগুন থেকে বের করতে হবে।"

আলিমুজ্জামান সাহেব থামলেন।

আমি বললাম, বের করতে পেরেছিলেন ?

'হ্যাঁ।'

'বাচ্চাটা বেঁচেছিল ?'

'না বাঁচেনি। বাঁচার কথাও না। আমার গায়ে থার্ড ডিগ্রি বার্ন হয়ে গেল। কুমিল্লা মেডিক্যালে কিছুদিন থাকলাম, তারপর আমাকে পাঠানো হলো ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে। দু'মাসের ওপর হাসপাতালে থাকতে হবে। এক পর্যায়ে ডাক্তাররা আমাকে বাঁচানোর আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। সেই সময় বার্ন-এর চিকিৎসার তেমন ব্যবস্থা ছিল না। স্কিন গ্রাফটিং হতো না। অল্পতেই শরীরে ইনফেকশন হয়ে যেত। যা-ই হোক, বেঁচে গেলাম, তবে সেই বছর পরীক্ষা দিতে পারলাম না।'

আলিমুজ্জামান নিশ্বাস নেবার জন্যে থামামাত্র আমি বললাম, আপনি একজন অসাধারণ মানুষ!

'মোটেই না। আমাকে বোকা বলতে পারেন। সামান্য একটা কুকুরছানার জন্যে নিজের জীবন যেতে বসেছিল। তখন সবাই আমার বোকামির কথাটা আলোচনা করত। আমার নিজেরও মাঝে মাঝে মনে হয়েছে হয়তো বোকামিই করেছি। একজন মানুষের জীবন কুকুরের জীবনের চেয়ে অবশ্যই মূল্যবান।'

'আপনার গল্প শুনে মুগ্ধ হয়েছি।'

'এটা কিন্তু গল্প না। এটা গল্পের ভূমিকা, মূল গল্প এখন বলব।

'ঢাকা থেকে সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরেছি। শরীর তখনও খুব দুর্বল। ডাক্তার বলে দিয়েছে প্রচুর রেস্ট নিতে। শুয়েবসেই দিন কাটছে। আমার ঘর দোতলায়। মাথার কাছে বিরাট জানালা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে শুয়ে থাকতে খুব খারাপ লাগে না।

এক রাতের কথা। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। ফকফকে জ্যোৎস্না। এই জ্যোৎস্নায় অদ্ভুত একটা দৃশ্য চোখে পড়ল। রাজ্যের কুকুর এসে জড়ো হয়েছে বাসার সামনে। কেউ কোনো সাড়াশব্দ করছে না বা ছোটাছুটি করছে না। সবক'টা মূর্তির মতো বসে আছে। আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ব্যাপারটা কী ?

www.BDeBooks.Com

একসঙ্গে এতগুলি কুকুর আমি আগে কখনো দেখিনি। এদের এইজাতীয় আচরণের কথাও শুনিনি। আমাকে তাকাতে দেখে এরা সবাই মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল।

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি— দেখি হঠাৎ তাদের মধ্যে একধরনের চাঞ্চল্য দেখা গেল। এরা একে একে চলে গেল। যেন ওদের কোনো গোপন অনুষ্ঠান ছিল, অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে, এখন চলে যাচ্ছে।

এই ব্যাপার মাঝে মাঝে ঘটতে লাগল। নির্দিষ্ট কোনো সময় না। মাসে একবার কিংবা দুমাসে একবার এরকম হয়।

এরকম একটা ঘটনা চাপা থাকার কথা নয়। সবাই জেনে গেল। অনেকেই দুপুর রাতে কুকুরের দল দেখতে আসত। খবরের কাগজেও ঘটনাটা উঠেছিল। দৈনিক আজাদে হেডলাইন ছিল— কুকুরের কাণ্ড।

আমার ছোট বোন আমাকে খুব খ্যাপাত। সে বলত কুকুরের জন্যে তুমি জীবন দিতে যাচ্ছিলে— কাজেই তারা তোমাকে তাদের রাজা বানিয়েছে। তুমি হচ্ছ 'কুকুর-রাজা'।

আমার বাবা পরের বছর বদলি হয়ে পাবনা চলে গেলেন। আমিও বাবার সাথে গেলাম। সেখানেও একই কাণ্ড— এক মাস দুমাস পরপর হঠাৎ রাজ্যের কুকুর বাসার সামনে এসে জড়ো হয়, মূর্তির মতো চুপচাপ বসে থাকে। একবার আমার চোখ পড়ামাত্র মাথা নিচু করে চলে যায়। যেখানে গিয়েছি এই কাণ্ড ঘটছে। যেন কোনো-এক অদ্ভুত উপায়ে কুকুররা আমার খবর পৌঁছে দিয়েছে। শুধু তা-ই না, আমার মনে হয় কুকুররা আমাকে পাহারা দেয়। আমি যখন রাস্তায় হাঁটি, একটা-দুটা কুকুর সবসময় আমার সঙ্গে থাকে।

আজ আমার বয়স সাতষট্টি। তবে কুকুরের সভা আগের মতো ঘনঘন হয় না। ছমাসে, এক বছরে একবার হয়। তবে হয়। কুকুরের ভাষা আমি জানি না। জানলে জিজ্ঞেস করতাম— তোমরা কী চাও ? এইসব কেন তোমরা কর ?'

'ব্যাপারটা কি আপনার পছন্দ হয় না ?'

'না, পছন্দ হয় না। একদিন দুদিনের ব্যাপার হলে হয়তো পছন্দ হতো। একদিন দুদিনের ব্যাপার তো নয়। দিনের পর দিন ঘটছে।'

'ভবিষ্যতে আবারও হবে বলে কি আপনার ধারণা ?'

'হ্যাঁ হবে। আজ রাতেও হতে পারে। আপনি দেখতে চান ?'

বলতে বলতে আলিমুজ্জামান সাহেবের চোখমুখ বিকৃত হয়ে গেল। যেন তিনি প্রচণ্ড রাগ করছেন। যেন এই মুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠবেন।

আমি বললাম, আপনি মনে হয় পুরো ব্যাপারটায় খুব আপসেট। এত আপসেট হবার কিছু নেই। পশুরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে— এতে রাগ হবার কী আছে! কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অধিকার নিশ্চয়ই পশুদেরও আছে।

'এটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনো ব্যাপার নয়। এটা একটা ভৌতিক ব্যাপার। সুপার ন্যাচারাল ব্যাপার।'

'এর মধ্যে সুপার ন্যাচারালের অংশ কোনটি ?'

'পুরো ব্যাপারটিই সুপার ন্যাচারাল। এই অংশটি আপনাকে বলিনি বলে আপনি বুঝতে পারছেন না।'

'বলুন শুনি।'

'যে-কুকুরছানাটিকে আমি বাঁচাতে চেয়েছিলাম সেই কুকুরছানাটি দলটার মধ্যে সবসময় থাকে। পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া একটা কুকুর। গলায় ঘুঙুর বাঁধা। কুকুরছানাটা মাথা দোলায় আর ঘুঙুরের শব্দ হয়।'

'আপনি ছাড়া অন্যরাও কি এই কুকুরছানাটা দেখে ?'

'না, আর কেউ দেখতে পায় না। শুধু আমি দেখতে পাই। দেখুন ভাই, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র না। আমার বিষয় ইতিহাস। তবু অবৈজ্ঞানিক কোনোকিছু আমি আমার জীবনে গ্রহণ করিনি। ভূত-প্রেত, ঝাড়-ফুঁক, পীর-ফকির কিছুই না, অথচ সেই আমাকে কিনা সারাজীবন একটি অতিপ্রাকৃত বিষয় হজম করে যেতে হচ্ছে।'

আমি বললাম, আবার কখনো এরকম কিছু হলে আপনি দয়া করে আমাকে খবর দেবেন। তিনি জবাব দিলেন না।

আমি বিদায় নিয়ে চলে এলাম, তার পাঁচ মাস পর রাত দুটোয় টেলিফোন বেজে উঠল। আলিমুজ্জামান সাহেব টেলিফোন করেছেন। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, ওরা এসেছে। আপনি কি আসবেন ?

শ্রাবণ মাসের রাত। বাইরে ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে। বাড়ির বাইরে পা দিলেই এক-হাঁটু পানি। এমন দুর্যোগের রাতে কোথাও যাবার প্রশ্নই ওঠে না। আমি টেলিফোন নামিয়ে বিছানায় চাদরের নিচে ঢুকে পড়লাম।

www.BDeBooks.Com

ভয়

ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার কীভাবে পরিচয় হলো আগে বলে নিই। কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার এগজামিনার হয়ে পাড়াগাঁ ধরনের এক শহরে গিয়েছি (শহর এবং কলেজের নাম বলার প্রয়োজন দেখছি না। মূল গল্পের সঙ্গে এদের সম্পর্ক নেই। নামগুলি প্রকাশ করতেও কিছু অসুবিধা আছে)। এই অঞ্চলে আমি কখনো আসিনি। পরিত্যক্ত এক রাজবাড়িতে কলেজ বানানো হয়েছে। গাছ-গাছড়ায় চারদিক আচ্ছন্ন। বিশাল কম্পাউণ্ড। কিন্তু লোকজন নেই, পরীক্ষার জন্যে কলেজ ছুটি হয়ে গেছে। খাঁ খাঁ করছে চারদিক। আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম।

একটা সময় ছিল যখন এগজামিনারদের আলাদা খাতিরযত্ন ছিল। কলেজের প্রিন্সিপাল নিজের বাসায় রাখতেন। সকাল-বিকাল নানান ধরনের খাবার। জাল ফেলে পাকা রুই ধরা হতো। যত্নের চূড়ান্ত যাকে বলে। এখন সেই দিন নেই। কেউ পাত্তাই দেয় না। বিরক্ত চোখে তাকায়।

আমার জায়গা হলো কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরির পাশে একটা খালি কামরায়। প্রিন্সিপাল সাহেব বললেন, আপনাকে হোস্টেলেই রাখতে পারতাম। কিন্তু বুঝতেই পারছেন চারদিকে থাকবে ছাত্র। আপনি অস্বস্তি বোধ করবেন। ছাত্ররা তো আর আগের মতো নেই। মদটদ খায়। একবার বাজে মেয়ে নিয়ে এসে নানা কীর্তি করেছে। বিশ্রী ব্যাপার। তবে আপনার খাওয়াদাওয়ার কোনো অসুবিধা হবে না। আমার বাসা থেকে খাবার যাবে।

থাকার ঘর দেখে চমকে উঠলাম। আগে বোধহয় স্টোররুম ছিল। একটামাত্র জানালা। রেলের টিকিট দেয়ার জানালার মতো ছোট। ঘরভরতি

মাকড়সার ঝুল। দুটি বিশাল এবং কুৎসিত মাকড়সা পেটে ডিম নিয়ে বসে আছে। এই নিরীহ প্রাণীটিকে আমি অসম্ভব ভয় পাই। এদের ছায়া দেখলেও আমার গা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। ঝাড়ুদারকে পাঁচটা টাকা দিলাম মাকড়সার ঝুল পরিষ্কার করার জন্যে। সে কী করল কে জানে! ঘর যেমন ছিল তেমনি রইল। দুটির জায়গায় এখন দেখছি তিনটি মাকড়সা। তৃতীয়টির গায়ের রং কালো। চোখ জ্বলজ্বল করছে।

সন্ধ্যাবেলা হারিস নামের একজন লোক একটা হারিকেন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। অথচ দিনের বেলায় ইলেকট্রিসিটি আছে দেখেছি। হারিস বলল— রাত দশটার পর কারেন্ট আসে। আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। রাত দশটার পর আমি কারেন্ট দিয়ে করব কী ?

সন্ধ্যার পর এলেন কেমিস্ট্রির ডেমনেসট্রেটর সিরাজউদ্দিন। এঁর সঙ্গে আমার সকালে একবার দেখা হয়েছে। তখন বোধহয় তেমন মনোযোগ দিয়ে দেখিনি। মুখভরতি আর্নেস্ট হেমিংওয়ের মতো চাপদাড়ি। মাথায় টুপি। চোখে সুরমা। গা থেকে আতরের গন্ধ বেরুচ্ছে। বেঁটেখাটো একজন মানুষ। বয়স পঞ্চাশের মতো হলেও চমৎকার স্বাস্থ্য। এই গরমেও গায়ে ঘিয়া রঙের একটা চাদর। তিনি কথা বলেন খুব সুন্দর করে।

'স্যার কেমন আছেন ?'

'ভালোই আছি।'

'আপনার খুব তকলিফ হলো স্যার।'

'না, তকলিফ আর কী ?'

'আগে এগজামিনার সাহেবরা এলে প্রিন্সিপাল স্যারের বাসায় থাকতেন। কিন্তু ওঁর এক ছেলের মাথায় দোষ আছে। প্রিন্সিপাল স্যার এখন আর কাউকে বাসায় রাখেন না। ছেলেটা বড় ঝামেলা করে।'

আমি বললাম, আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

সিরাজউদ্দিন সাহেব ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, স্যার, ভেতরে এসে একটু বসব ?

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আসুন গল্প করি।'

সিরাজউদ্দিন সাহেব বসতে বসতে বললেন, এখানে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের একটা ডাকবাংলো আছে। আপনাকে সেখানে রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে রেভিনিউর সি.ও. তাঁর ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন। কোয়ার্টারের খুব অভাব।

www.BDeBooks.Com

'বুঝতে পারছি। এই নিয়ে আপনি ভাববেন না। দিনের বেলাটা তো কলেজেই কাটবে। রাতে এসে শুধু ঘুমানো। বইপত্র নিয়ে এসেছি, সময় কাটানো কোনো সমস্যা না।

সিরাজউদ্দিন সাহেব ইতস্তত করে বললেন, রাতে ঘর থেকে বেরুতে হলে একটু শব্দ-টব্দ করে তারপর বেরুবেন। খুব সাপের উপদ্রব।

'তা-ই নাকি ?'

'জী স্যার। এখন সাপের সময়। গরমে অতিষ্ঠ হয়ে গর্ত থেকে বের হয়। হাওয়া খায়।'

আমার গা হিম হয়ে গেল। এ তো মহাযন্ত্রণা! প্রায় দুশো গজ দূরে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে বাথরুম। আমার আবার রাতে কয়েকবার বাথরুমে যেতে হয়।

'তবে স্যার ঘরের মধ্যে কোনো ভয় নেই। চারদিকে কার্বলিক অ্যাসিড দিয়ে দিয়েছি। সাপ আসবে না।'

'না এলেই ভালো।'

'যদি স্যার আপনি অনুমতি দেন পা উঠিয়ে বসি।'

'বসুন বসুন। যেভাবে আপনার আরাম হয় সেভাবেই বসুন।'

ভদ্রলোক পা উঠিয়ে বসলেন এবং একের পর এক সাপের গল্প শুরু করলেন। সেইসব গল্পও অতি বিচিত্র। রাতে ঘুম ভেঙেছে, হঠাৎ তার মনে হলো নাভির উপর চাপ পড়ছে। চোখ মেললেন। ঘরে চাঁদের আলো। সেই আলোয় লক্ষ করলেন একটা সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে তাঁর নাভির উপর শুয়ে ঘুমুচ্ছে, আসল সাপ— শঙ্খচূড়।

একসময় আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, সাপের গল্প আর শুনতে ইচ্ছা করছে না। দয়া করে অন্য গল্প বলুন।

ভদ্রলোক সম্ভবত সাপের গল্প ছাড়া অন্য কোনো গল্প জানেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শুরু করলেন সাপের সঙ্গমদৃশ্যের বর্ণনা। চৈত্রমাসের এক জ্যোৎস্নায় তিনি এই দৃশ্য দেখেছেন। বর্ণনা শুনে আমার গা ঘিনঘিন করতে লাগল। সিরাজউদ্দিন সাহেব বললেন, সাপ যে-জায়গায় এইসব করে তার মাটি কবচে ভরে কোমরে রাখলে পুরুষত্ব বাড়ে।

বিজ্ঞানের একজন শিক্ষকের মুখে কী অদ্ভুত কথা! আমি ঠাট্টা করে বললাম, আপনি সেখানকার মাটি কিছু সংগ্রহ করলেন ?

তিনি আমার ঠাট্টা বুঝতে পারলেন না। সরল ভঙ্গিতে বললেন, জী না স্যার।

লোকটি নির্বোধ। নির্বোধ মানুষের সঙ্গে আমার কথা বলতে ভালো লাগে না। কিন্তু এই লোক উঠছে না। সাপ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সে আমাকে দেবে বলে বোধহয় তৈরি হয়েই এসেছে। মুক্তি পাবার জন্যে একসময় বলেই ফেললাম, সারাদিনের জার্নিতে টায়ার্ড হয়ে এসেছি। যদি কিছু মনে না করেন বাতিটাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ব।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, কী বলছেন স্যার ? ভাত না খেয়ে ঘুমাবেন ? ভাত তো এখনও আসেনি। দেরি হবে। আমি প্রিন্সিপাল সাহেবের বাসা থেকে খোঁজ নিয়ে তারপর আপনার কাছে এসেছি। আমি যাওয়ার পর রান্না চড়িয়েছে। গোশত রান্না হচ্ছে।

'তা-ই নাকি ?'

'জী। আপনি গরু খান তো ?'

'জী, খাই।'

'এখানে কসাইখানা নাই। মাঝে মাঝে গরু কাটা হয়। আজ হাটবার। তাই গরু কাটা হয়েছে। প্রিন্সিপাল সাহেব দুই ভাগ নিয়েছেন।'

'ও আচ্ছা।'

'পঁচিশ টাকা করে ভাগ।'

'তা-ই বুঝি ?'

'প্রিন্সিপাল স্যারের স্ত্রীর রান্না খুব ভালো।'

'তা-ই নাকি ?'

'জী। তবে আজ রান্না করছে তাঁর ছেলের বউ। যে-ছেলেটা পাগল—তার বউ।'

'ও আচ্ছা।'

'বিরাট অশান্তি চলছে প্রিন্সিপাল স্যারের বাড়িতে। ছেলে বঁটি নিয়ে তার মাকে কোপ দিতে গেছে। বউ গিয়ে মাঝখানে পড়ল। এখন ছেলেকে বেঁধে রেখেছে। এইজন্যেই রান্নায় দেরি হচ্ছে।'

'কোনো হোটেলে গিয়ে খেয়ে এলেই হতো। এদের দুঃসময়ে...'

'কী যে বলেন স্যার! আপনি আমাদের মেহমান না ? তা ছাড়া ভদ্রলোকের খাওয়ার মতো হোটেল এই জায়গায় নাই। নিতান্তই গণ্ডগ্রাম। হঠাৎ সাবডিভিশন হয়ে গেল। ভালো একটা চায়ের দোকান পর্যন্ত নাই।'

রাত সাড়ে দশটায় খাবার এল। দুটো প্লেট, সিরাজউদ্দিন সাহেবও আমার সঙ্গে খেতে বসলেন। হাত ধুতে ধুতে বললেন, প্রিন্সিপাল স্যার আমাকে আপনার সঙ্গে খেতে বলেছেন। আপনি হচ্ছেন আমাদের মেহমান। আপনি একা একা খাবেন, তা কি হয়!

www.BDeBooks.Com

প্রিন্সিপাল সাহেবের ছেলের বউ অনেক কিছু রান্না করেছে। অসাধারণ রান্না। সামান্য সব জিনিসও রান্নার গুণে অপূর্ব হয়েছে। মেয়েটার জন্যে আমার কষ্ট হতে লাগল। বেচারি হয়তো চোখের জল ফেলতে ফেলতে রেঁধেছে। আজ রাতে হয়তো কিছু খাবেও না।

'সিরাজউদ্দিন সাহেব!'

'জী স্যার ?'

'প্রিন্সিপাল সাহেবের ছেলের বউকে বলবেন, আমি এত ভালো রান্না খুব কম খেয়েছি। দ্রৌপদী এরচে ভালো রাঁধত বলে আমার মনে হয় না।'

'জী স্যার, বলব। তবে প্রিন্সিপাল স্যারের স্ত্রীর রান্নার কাছে এ কিছুই না। আছেন তো কিছুদিন নিজেই বুঝবেন।'

প্রিন্সিপাল সাহেবকে বেশ বিচক্ষণ বলে মনে হলো। তিনি একটা টর্চলাইট পাঠিয়েছেন। ফ্লাস্কভরতি চা পাঠিয়েছেন। পান সুপারি জর্দাও আছে কৌটায়।

খাওয়াদাওয়ার পর সিরাজউদ্দিন সাহেব অনেকক্ষণ বসে রইলেন। চা খেলেন, পান খেলেন, দীর্ঘ একটা সাপের গল্প বললেন। বিদায় নিলেন রাত এগারোটার পর। যে-লোকটি ক্রমাগতই সাপের কথা বলছে তার দেখলাম তেমন ভয়টয় নেই। টর্চ বা লাঠি ছাড়াই দিব্যি হনহন করে চলছে।

আমি দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে বসলাম। নতুন জায়গায় চট করে ঘুম আসবে না। শুয়ে শুয়ে হালকা ধরনের কিছু বই পড়া যায়। হারিকেনের এই আলোয় সেটা সম্ভব হবে না। আমি সিগারেট ধরিয়ে সুটকেস খুললাম বই বের করব। ঠিক তখন একটা কাণ্ড হলো। প্রচণ্ড ভয় লাগল। অথচ ভয়ের কোনোই কারণ ঘটেনি। তবু আমার হাত-পা কাঁপতে লাগল। যেন বন্ধ দরজার ওপাশেই অশরীরী কিছু দাঁড়িয়ে আছে। যেন এক্ষুনি সেই অশরীরী অতিথি ভয়ংকর কিছু করবে। নিজের অজান্তেই আমি চেঁচিয়ে উঠলাম— কে, কে ? আর তখন শুনলাম থপ থপ শব্দে একজন কেউ যেন দূরে চলে যাচ্ছে। ছোট্ট একটা কাশির শব্দও শুনলাম।

ভয়টা যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ চলে গেল। আমি খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। চাঁদের আলোয় চারদিক থৈথৈ করছে। কোথাও কেউ নেই। হঠাৎ এই অস্বাভাবিক ভয় আমাকে অভিভূত করল কেন ? এখনও গা ঘামে ভেজা। হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে। আমি শারীরিকভাবে পুরোপুরি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম। হালকা বাতাস দিচ্ছে, বেশ লাগছে দাঁড়িয়ে থাকতে। লুঙ্গিপরা

খালি গায়ের একটি লোক বিড়ি টানতে টানতে আসছে। আমাকে দেখেই বিড়ি লুকিয়ে ফেলে বলল, আদাব স্যার।

'আদাব। তুমি কে ?'

'আমার নাম কালিপদ। আমি কলেজের দারোয়ান।'

'তুমি কিছুক্ষণ আগে কি এইখানেই ছিলে ?'

'জী স্যার। লাইব্রেরি ঘরের সামনে বসে ছিলাম।'

'কাউকে যেতে দেখেছ ?'

'আজ্ঞে না। কেন স্যার ? কী হইছে ?'

'না, এমনি।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ইলেকট্রিসিটি চলে এল। আমি নিশ্চিন্ত মনে বই নিয়ে শুতে গেলাম। স্টিফান কিংয়ের লেখা ভৌতিক উপন্যাস। দারুণ রগরগে ব্যাপার। একবার পড়তে শুরু করলে ছাড়তে ইচ্ছা করে না। ভয়-ভয় লাগে আবার পড়তেও ইচ্ছা করে। পুরোপুরি ঘুমুতে গেলাম একটার দিকে। বারবার মনে হতে লাগল কিছুক্ষণ আগে এই অস্বাভাবিক ভয়টা কেন পেলাম ? রহস্যটা কী ?

আমি খুব একটা সাহসী মানুষ এরকম দাবি করি না। কিন্তু অকারণে এত ভয় পাবার মতো মানুষও আমি নই। একা একা বহু রাত কাটিয়েছি।

সে-রাতে আমার ভালো ঘুম হলো না।

দিনের বেলাটা খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটল। একুশজন ছেলে পরীক্ষা দেবে। জোগাড়যন্ত্র কিছুই নেই। ল্যাবরেটরির অবস্থা শোচনীয়। একটামাত্র 'ব্যালেন্স' তাও ঠিকমতো কাজ করছে না। প্রয়োজনীয় কেমিক্যালসও নেই। সে নিয়ে কারো মাথাব্যথাও নেই। কেমিস্ট্রির দুজন টিচার। ওঁরা নির্বিকার ভঙ্গিতে বসে আছেন। একজন আমাকে বলে গেলেন, কলেজের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন। ক্লাস-টেলাসও তেমন হয়নি। একটু দেশেশুনে নেবেন স্যার। পাস মার্কটা দিয়ে দেবেন।

আমি হেসে বললাম, কী করে দেব বলুন। দেবার তো একটা পথ লাগবে। এরা তো মনে হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল কাজ কিছুই করেনি।

কী করে করবে বলেন। স্ট্রাইক-ফ্রাইক লেগেই আছে। জিনিসপত্রও কিছু নেই।

একমাত্র সিরাজউদ্দিন সাহেবকে দেখলাম ব্যবস্থা করার জন্য ছুটাছুটি করছেন। চেষ্টা করছেন কীভাবে ছাত্রদের খানিকটা সাহায্য করা যায়।

www.BDeBooks.Com

একুশজন ছাত্রছাত্রীর কেউ তাঁকে এক মুহূর্তের জন্যে চোখের আড়াল করতে রাজি নয়। একটি মেয়ে সল্ট অ্যানালিসিসে কিছুই না পেয়ে তাদের স্বভাবমতো কাঁদতে শুরু করেছে। সিরাজউদ্দিন সাহেব তাকে একটা ধমক দিলেন, খবরদার কাঁদবি না। কাঁদলে চড় খাবি। গোড়া থেকে কর। ড্রাই টেস্টগুলি আগে কর। আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে করবি।

এগজামিনারদের একটা দায়িত্ব হচ্ছে লক্ষ রাখা যেন ছাত্ররা তাদের নিজেদের কাজগুলি নিজেরাই করে। কিন্তু সবসময় দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না। দেখেও না-দেখার ভান করতে হয়। এখন যেমন করছি। ছাত্রদের জন্যে আমার খানিকটা মমতাও লাগছে। যন্ত্রপাতি নেই, কেমিক্যালস নেই, স্যারদের কোনো আগ্রহ নেই, ছেলেরা করবে কী ?

দুপুরবেলা প্রিন্সিপাল সাহেব দেখতে এলেন পরীক্ষা কেমন হচ্ছে। ভদ্রলোককে মনে হয় বিপর্যস্ত। কিছুক্ষণ মুখ কুঁচকে রেখে বললেন, দেন, সবকটিকে ফেল করিয়ে দেন। ঝামেলা চুকে যাক।

কোনো প্রিন্সিপালকে এরকম কথা বলতে শুনিনি। আমি হেসে ফেললাম। প্রিন্সিপাল সাহেব বললেন, রাতে অসুবিধা হয়নি তো ?

'জী না, হয়নি।'

'সিরাজউদ্দিনকে আপনার খোঁজখবর রাখতে বলেছি। কোনোকিছু দরকার হলেই তাকে বলবেন। সংকোচ করবেন না।'

'না করব না।'

'সাপের গল্প বলে মাথা খারাপ করিয়ে দেবে। পাত্তা দেবেন না। এখানে সাপের উপদ্রব একেবারেই নেই।'

'তা-ই নাকি ?'

'আপনাকে ভয় খাইয়ে দিয়েছে বোধহয় ? আমাকেও দিয়েছিল। প্রথম যখন আসি, এমন অবস্থা, ঘর থেকে বেরুবার আগে হারিকেন, লাঠি এইসব নিয়ে বের হতাম। হা হা হা।'

প্রিন্সিপাল সাহেব বেশিক্ষণ দাঁড়ালেন না। আগামীকাল সন্ধ্যায় চা খাবার দাওয়াত দিয়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে চলে গেলেন।

পাঁচটায় পরীক্ষা শেষ হবার কথা। শেষ হলো রাত ন'টায়। সিরাজউদ্দিন সাহেবের বিধ্বস্ত অবস্থা। আমি হাসতে হাসতে বললাম, পরীক্ষা তো আপনার ছাত্ররা দেয়নি, দিয়েছেন আপনি। মনে হচ্ছে ভালোই দিয়েছেন।

আমার সঙ্গেই তিনি ঘরে ফিরলেন। খাওয়াদাওয়া করে নিজের জায়গায় ফিরে যাবেন। অতিরিক্ত ক্লান্ত থাকার জন্যেই বোধহয় আর সাপের গল্প শুরু হলো না। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করে তিনি উঠে পড়লেন।

'স্যার যাই। দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েন। রাতবিরাতে বেরুবার সময় একটু খেয়াল রাখবেন। শব্দ করে পা ফেলবেন। সাপেরই এখন সিজন।'

'খুব খেয়াল রাখব।'

আমি দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে বসামাত্র ঠিক আগের মতো হলো। তীব্র একটা ভয় আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। থরথর করে হাত-পা কাঁপছে। নিশ্বাস নিতে পারছি না। মনে হচ্ছে এক্ষুনি বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যাব। দরজার কড়ায় টন করে একটা শব্দ হলো। যেন কেউ কড়া নাড়তে গিয়েও কড়া নাড়ল না। ঠিক তখন ভয়টা চলে গেল। আমি পুরোপুরি স্বাভাবিক। জগ থেকে ঢেলে এক গ্লাস পানি খেলাম। গলা উঁচিয়ে ডাকলাম— কালিপদ, কালিপদ! কেউ সাড়া দিল না। আজ বোধহয় ডিউটি দিচ্ছে না।

বারান্দায় একটা চেয়ার টেনে এনে বসলাম। সিগারেট ধরালাম। আকাশে অল্প মেঘ। মাঝে মাঝে মেঘের আড়ালে চাঁদ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে আবার ভেসে উঠছে। অপূর্ব আলোআঁধারি। ঢাকা শহরে বসে এই দৃশ্য ভাবাই যায় না। তবে বড় বেশি নির্জন। ঝিঁঝিঁ ডাকছে। কিন্তু সেই ঝিঁঝিঁর ডাকও ম্যাজিকের মতো হঠাৎ করে থেমে যাচ্ছে। সেই সময়টা বেশ অদ্ভুত মনে হয়। সবাই যেন বিরাট কোনো ঘটনার জন্যে অপেক্ষা করছে। বইপত্র পড়ে আমার ধারণা হয়েছিল শিয়াল বোধহয় প্রহরে প্রহরে ডাকে। এই ধারণাও দেখলাম সত্যি না। সারাক্ষণই শিয়াল ডাকছে। সেই ডাকের মধ্যে একটা করুণ ব্যাপার আছে, শুনতে ভালো লাগে।

ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে নিয়ে আবার এসে বসলাম বারান্দায়। আর তখন দেখলাম কালিপদ আসছে। তার হাতে একগাদা এঁটো বাসনকোসন। সম্ভবত পুকুরে ধোবে।

'এই কালিপদ!'

'আদাব স্যার।'

'একটু শুনে যাও তো!'

কালিপদ এগিয়ে এসে মাথা নুইয়ে প্রণাম করল। হিন্দুদের প্রণামের এই ভঙ্গিটি বেশ সুন্দর।

'রাতদুপুরে ধুতে যাচ্ছ নাকি?'

'হ স্যার।'

'আচ্ছা, তুমি কি সিরাজউদ্দিন সাহেবের বাসা চেন?'

'আজ্ঞে চিনি।'

'কতদূর?'

www.BDeBooks.Com

'দুই মাইলের উপরে হইব।'

'কালিপদ, তুমি একটা কাজ করতে পারবে ?'

'নিশ্চয়ই পারব স্যার, বলেন।'

'তুমি কি আমাকে ওঁর বাসায় নিয়ে যেতে পারবে ?'

কালিপদ অবাক হয়ে বলল, এখন ?

'হ্যাঁ এখন। তুমি তোমার কাজ সেরে আসো, তারপর যাব।'

'আমি উনারে ডাইকা নিয়ে আসি ?'

'না, ডেকে আনতে হবে না। আমিই যাব। তোমার কোনো অসুবিধা আছে ?'

'আজ্ঞে না, অসুবিধা নাই। আমি আসতাছি।

সিরাজউদ্দিনের বাসায় যাবার ব্যাপারটা যে আমি ঝোঁকের মাথায় করলাম তা না। আমার নিশ্চিত ধারণা হয়েছে যে সিরাজউদ্দিনের সঙ্গে আমার হঠাৎ ভয় পাবার একটা সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্ক বের করতে না পারলে আজ রাতেও আমার ঘুম হবে না। আধিভৌতিক কোনো ব্যাপারেই আমার বিশ্বাস নেই। কার্যকারণ সম্পর্ক ছাড়া এ-পৃথিবীতে কিছুই ঘটে না। বস্তুজগতের প্রতিটি বস্তুকেই নিউটনের গতিসূত্র মানতে হয়।

ডালভাঙা ক্রোশ বলে একটা কথা বইপত্রে পড়েছি। আজ রাতে সেটা বাস্তবে জানা গেল। হাঁটছি তো হাঁটছিই। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করছি, কালিপদ আর কতদূর ? সে তার উত্তরে ফোঁৎ-জাতীয় একটা শব্দ করছে। লোকটি কথা কম বলে, কথাবার্তা হ্যাঁ না-র মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিংবা কে জানে গ্রামট্রামের দিকে হয়তো চলতি অবস্থায় কথা কম বলার নিয়ম। তার ওপর লক্ষ করলাম লোকটি একটু ভীতু টাইপের, কোনো শব্দ হতেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। আমি যখন বলছি— কী হলো কালিপদ ? তখন আবার হাঁটা শুরু করছে। আমি আগেও দেখেছি দারোয়ানরা সবসময় ভীতু ধরনের হয়।

একসময় আমরা ছোটখাটো একটা নদীর ধারে চলে এলাম। বর্ষাকালে এর চেহারা রমরমা থাকলেও থাকতে পারে, এখন দেখাচ্ছে সরু ফিতার মতো। পায়ের পাতাও হয়তো ভিজবে না।

'কালিপদ, নদীর নাম কী ?'

'বিরুই নদী।'

'বিরুই চালের কথা শুনেছি, এই নামে যে নদীও আছে কে জানত! নদী পার হতে হবে ?'

'আজ্ঞে না।'

'এসে পড়েছি নাকি ?'

'হ।'

সে হ বলেও থামছে না। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে না কোথাও থামবে। মনে হচ্ছে এটা আমাদের অনন্ত যাত্রা। সিরাজউদ্দিনের সঙ্গে কথাবার্তা কী বলব কিছুই ঠিক করিনি। আগে থেকে ঠিকঠাক করে গেলে কোনো লাভ হয় না। আসল কথা বলবার সময় ঠিক করে রাখা কথা একটাও মনে আসে না। কতবার এরকম হয়েছে। যৌবনে জরি নামের একজন কিশোরীর সঙ্গে বেশ ভালো পরিচয় ছিল। খুব সাহসী মেয়ে। সে নিজ থেকেই একবার আমাকে খবর পাঠাল আমি যেন সন্ধ্যাবেলায় তাদের ছাদে অপেক্ষা করি। সারাদিন ভাবলাম ছাদের নির্জনতায় কীসব কথা বলব। কতটুকু আবেগ থাকবে। কোন পর্যায়ে হাতে হাত রাখব। বাস্তবে তার কিছুই হলো না। প্রচণ্ড ঝগড়া বেধে গেল। জরি কাঁদোকাঁদো গলায় বলল, ছোটলোক। আমি কড়া গলায় বললাম, আমি ছোটলোক না, ছোটলোক হচ্ছ তুমি। শুধু তুমি একা না, তোমার বাড়ির সবাই ছোটলোক। এবং তোমার বড় মামা একটা ইতর। আবেগ ভালোবাসার একটি কথাও দুজনের কেউ বললাম না।

'স্যার, এই বাড়ি।'

আমি থমকে দাঁড়ালাম। ছোট্ট একটা টিনের ঘর। কলাগাছ দিয়ে ঘেরা। খড়-পোড়ানো গন্ধ আসছে। পরিষ্কার ঝকঝকে উঠান। উঠানে দাঁড়াতেই কুকুর ডাকতে লাগল। চোর ভেবেছে বোধহয়। ভেতর থেকে সিরাজউদ্দিন চ্যাঁচাল, কে, কে ? কালিপদ বলল, দরজাটা খুলেন। আমি কালিপদ। দরজা সঙ্গে সঙ্গে খুলল না। হারিকেন জ্বালানো হলো। তাতে বেশ খানিকটা সময় লাগল। সিরাজউদ্দিন একটি লুঙ্গি পরে খালিগায়ে বের হয়ে এল। চোখ কপালে তুলে বলল, স্যার আপনি ?

'দেখতে এলাম আপনাকে।'

'কেন ?'

'কোনো কারণ নেই। ঘুম আসছিল না, ভাবলাম দেখি রাতের বেলা গ্রাম কেমন দেখা যায়। আপনি বোধহয় শুয়ে পড়েছিলেন ? ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ?'

'জী।'

'খুব লজ্জিত, কিছু মনে করবেন না।'

'আসেন, ভেতরে এসে বসেন।'

www.BDeBooks.Com

সিরাজউদ্দিন সাহেবের বিস্ময় এখনও কাটেনি। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, কোনো ঝামেলা হয়েছে স্যার ?

'না না, ঝামেলা কী হবে ? বেড়াতে এসেছি। একটু অসময়ে চলে এলাম এই আর কি!'

'স্যার, একটু চা করি ?'

'অসুবিধা না হলে করেন।'

'না না, কোনো অসুবিধা নাই। কোনো অসুবিধা নাই।'

সিরাজউদ্দিন সাহেব ছুটাছুটি শুরু করলেন। উঠোনে চুলা জ্বালানো হলো। কালিপদ দেখলাম টাকা নিয়ে আবার ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। হয়তো চা বা চিনি নেই, আনতে গেছে। এই রাতদুপুরে কোথায় এসব পাবে কে জানে!

'সিরাজউদ্দিন সাহেব!'

'জী স্যার ?'

'লোকজন দেখছি না যে ? আপনি একাই থাকেন নাকি ?'

'বিয়েশাদি তো করি নাই।'

'করেননি কেন ?'

'ভাগ্যে ছিল না। কষ্টের সংসার ছিল। নিজেই খেতে পেতাম না।'

'এখন তো বোধহয় অবস্থা সেরকম না।'

'জী এখন মাশাআল্লাহ সামলে উঠেছি। কিছু জমিজমাও করেছি।'

'তা-ই নাকি ?'

'অতি অল্প। ধানি জমি।'

'একা একা থাকেন ভয় লাগে না ?'

'ভয় লাগবে কেন ?'

সিরাজউদ্দিন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। আমি খানিকটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। ভয়ের ব্যাপারটা নিয়েই আমি আলাপ করতে চাই। কিন্তু কীভাবে সেটা করা যায় ? আমি ইতস্তত করে বললাম, আপনি ভূত বিশ্বাস করেন ?

জী না। এইসব হচ্ছে কুসংস্কার। এই গ্রামেই একটা রেন্ট্রি গাছ আছে। লোকে নানান কথা বলে। কী কী নাকি দেখে। আমি কোনোদিনই দেখি নাই। রাতবিরাতে কত যাওয়া-আসা করেছি।

চা তৈরি হয়েছে। চিনি ছিল না। খেজুর রসের চা। চমৎকার পায়েস পায়েস গন্ধ। কাপে চুমুক দিতে দিতে সিরাজউদ্দিন বললেন, তবে জিন বলে একটা জিনিস আছে।

আমি কৌতূহলী হয়ে বললাম, আপনি বিশ্বাস করেন ?

'করব না কেন ? কোরান শরিফে পরিষ্কার লেখা জিন এবং ইনসান। হাশরের দিনে মানুষের যেমন বিচার হবে, জিনেরও হবে।'

'আপনি জিন দেখেছেন কখনো ?'

'জী না। সাধারণ লোকে দেখে না।'

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম। সিরাজউদ্দিন লোকটি আসলেই সাধারণ। কোনোরকম বিশেষত্ব নেই। আমার হঠাৎ ভয়ের সঙ্গে এই লোকটিকে কিছুতেই জড়ানো যাচ্ছে না। সরাসরি এই প্রসঙ্গটা আনাও মুশকিল। তবু একবার বললাম, আপনি চলে আসার পর ঐ রাতে কেমন যেন হঠাৎ করে ভয় পাই।

সিরাজউদ্দিন সাহেব সঙ্গে সঙ্গে উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, সাপ জিনিসটা তো ভয়েরই। ভয় পাওয়াটা ভালো। তাহলে সাবধানে চলাফেরা করবেন। অসাবধান হলেই সর্বনাশ। রাতে বের হলে টর্চলাইটটা সঙ্গে রাখবেন। শব্দ করে পা ফেলবেন।

বিদায় নিতে রাত একটা বেজে গেল। সিরাজউদ্দিন আমার সমস্ত আপত্তি আগ্রাহ্য করে এগিয়ে দিতে এলেন। তিনি এলেন বিরুই নদী পর্যন্ত। চাঁদের আলো আছে। চারদিক স্পষ্ট দেখা যায়। তবু তিনি জোর করে কালিপদের হাতে একটা হারিকেন ধরিয়ে দিয়ে উলটোদিকে রওনা হলেন। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। যতক্ষণ তাঁকে দেখা যায় ততক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। যেই মুহূর্তে তিনি বাঁশবনের আড়ালে পড়লেন ঠিক সেই মুহূর্তে আবার সেইরকম হলো। অন্ধ যুক্তিহীন ভয়। যেন ভয়ংকর অশুভ একটা-কিছু আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে ছুটে আসছে। সেই অশুভ জিনিসটাকে চোখে দেখা যায় না। কিন্তু আমি রক্তের প্রতি কণিকায় তাকে অনুভব করছি। এর ক্ষমতা অসাধারণ। এ অন্য জগতের কেউ। এ-জগতে তাকে কেউ জানে না। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় কাঁপিয়ে দিয়ে ভয়টা চলে গেল। কিছুটা ধাতস্থ হয়ে লক্ষ করলাম আমি মাটিতে বসে আছি। কালিপদ আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলছে, কী হইল স্যার ? কী হইল ?

'কিছু হয়নি। মাথাটা কেমন যেন করল।'

'মাথা ধুইবেন স্যার ? নদীর পানি দিয়া...।'

'মাথা ধুতে হবে না। চলো রওনা দিই।'

বলেও রওনা দিতে পারলাম না। ভয় একেবারেই নেই কিন্তু শরীর অবসন্ন। অসম্ভব ঘুম পাচ্ছে।

www.BDeBooks.Com

'কালিপদ!'

'জে আজ্ঞে ?'

'একটু আগে তোমার কি কোনো ভয়টয় লেগেছে ?'

'জে না।'

'ও আচ্ছা! চলো আস্তে আস্তে হাঁটি।'

কালিপদ বারবার মাথা ঘুরিয়ে আমাকে দেখছে। পাগল ভাবছে কি না কে জানে! ভাবলেও তাকে দোষ দেয়া যায় না। যে-লোক মাঝরাত্রিতে বেড়াতে বের হয়, অকারণে ভয় পেয়ে আধমরা হয়ে যায় সে আর যা-ই হোক খুব সুস্থ নয়।

পরের দিনটা আমার খুব খারাপ কাটল। কিছুতেই মন বসাতে পারি না। ভাইভা শুরু হয়েছে। ছাত্রদের প্রশ্নের জবাবগুলিও ঠিকমতো শুনছি না। বি.এস-সি পরীক্ষা দিতে এসে একজন দেখি সোডিয়াম ক্লোরাইডের ফরমুলাতে দুটি ক্লোরিন অ্যাটম দেখাচ্ছে। প্রচণ্ড রাগ হবার কথা। রাগও হচ্ছে না। পাস নম্বর দিয়ে বিদায় করে দিচ্ছি। কেমিস্ট্রির হেড বললেন, আপনার কি শরীর খারাপ ?

আমি ক্লান্ত গলায় বললাম, হ্যাঁ, কিছুতেই মন বসছে না। খুব টায়ার্ড লাগছে।

'রাতে ঘুম কেমন হয়েছে ?'

'ঘুম ভালোই হয়েছে।'

'যদি হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস করেন তাহলে এক ডোজ ওষুধ দিতে পারি।'

আমি বিরক্ত স্বরে বললাম, আপনি কি হোমিওপ্যাথিও করেন ?

'জী। ছোটখাটো একটা ডিসপেনসারি আছে। রুগীটুগি ভালোই হয়।'

মফস্বল কলেজের টিচারদের এই এক জিনিস। একটিমাত্র পেশায় তাঁরা খুশি নন। প্রত্যেকের দ্বিতীয় কোনো পেশা আছে। কোন পেশাটি প্রধান বোঝা মুশকিল।

'কী স্যার, হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস আছে ?'

'জী না, ভূতপ্রেত এবং হোমিওপ্যাথি এই তিন জিনিস আমি বিশ্বাস করি না। আপনি কিছু মনে করবেন না।'

ভদ্রলোক মুখ কালো করে বললেন, হোমিওপ্যাথি বিশ্বাস করেন না কেন ? এটা তো হাইলি সাইন্টিফিক ব্যাপার। হ্যানিম্যান সাহেবের কথাই ধরেন। উনি নিজে একজন পাস-করা ডাক্তার ছিলেন।

হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধে আমি একগাদা কথা বলতে পারতাম। টু হানড্রেড পাওয়ারের একটি ওষুধে যে আসলে কোনো ওষুধই থাকে না সেটা মোলার কনসাইট্রেশন এবং অ্যাবাগেড্রো নাম্বার দিয়ে সহজেই প্রমাণ করা যেত। তর্কের ক্ষেত্রে সবসময় তাই করি। আজ ইচ্ছা করছে না। পাঁচটা বাজতেই উঠে পড়লাম। পরীক্ষা তখনও চলছে— চলতে থাকুক। আমি বললাম, আপনারা ভাইভা শেষ করে দিন, আমি ঘরে চলে যাব।

'প্রিন্সিপাল সাহেবের বাসায় আপনার না চা খাওয়ার কথা ?'

ভুলেই গিয়েছিলাম। মনে পড়ায় মেজাজ আরো খারাপ হলো। কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না। তবু যেতে হবে।

প্রিন্সিপাল সাহেবও দাওয়াতের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। আমাকে দেখে অনেকক্ষণ অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থেকে বললেন, ও আচ্ছা আচ্ছা। আসুন আসুন। চা খেতে বলেছিলাম তা-ই না ? কিচ্ছু মনে নেই। আসুন বারান্দায় বসি। নানান ঝামেলায় আছি ভাই।

তিনি আমাকে বসিয়ে রেখে ভেতরে চলে গেলেন। অনেকক্ষণ তাঁর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। দরজা ধরে পাঁচ-ছ'বছর বয়সের মিষ্টি চেহারার একটি মেয়ে কৌতূহলী চোখে আমাকে দেখছে। এর সঙ্গে দু-একটা কথা বলা উচিত কিন্তু ইচ্ছা করছে না। বাড়ির ভেতর থেকে হিংস্র পশুর গর্জনের মতো গর্জন কানে আসছে। একটি মেয়েও কাঁদছে। কখনো কখনো কান্না থেমে যাচ্ছে আবার শুরু হচ্ছে। এইরকম অবস্থায় চায়ের জন্যে অপেক্ষা করাটাও অপরাধ।

'অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম। ছেলেটা বড় ঝামেলা করছে। শুনেছেন বোধহয় ?'

'জী শুনেছি।'

'ভালো খবর কেউ কখনো শোনে না, কিন্তু এইসব খবর সবাই শুনে ফেলে। নিতান্ত অপরিচিত লোকও এসে গায়ে পড়ে বিচিত্র সব চিকিৎসার কথা বলে।'

আমি চুপ করে রইলাম। প্রিন্সিপাল সাহেব তিক্ত গলায় বললেন, সেই জাতীয় চিকিৎসা এখন হচ্ছে। সাত নদীর পানিতে গোসল। ঠাণ্ডায় গোসল দিয়ে নিউমোনিয়া বাধাবে।

'ডাক্তারি চিকিৎসা করাচ্ছেন না ?'

'তাও আছে। বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক সবরকম চিকিৎসাই চলছে। কোনোটাই লাগছে না।'

www.BDeBooks.Com

'অসুখটা শুরু হলো কীভাবে ?'

প্রিন্সিপাল সাহেব দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। এই প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে হয়তো তাঁর ইচ্ছা করছে না। চা চলে এল। শুধু চা নয়। মিষ্টি, শিঙাড়া, কচুরি।

'নিন চা নিন। খিদে না থাকলে এই খাবারগুলি খাবেন না, সবই দোকানের কেনা। এদিকে আবার খুব ডায়রিয়া হচ্ছে।'

চা-টা চমৎকার। এক চুমুক দিয়েই মাথাধরাটা অনেকখানি সেরে গেল। প্রিন্সিপাল সাহেব অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বললেন, কী করে অসুখটা শুরু হলো সত্যি জানতে চান ?

'বলতে ইচ্ছে না করলে থাক।'

'না না শুনুন। গত বছর গরমের সময় আমার এই ছেলে তার বউকে নিয়ে এখানে আসে। আমি অনেক দিন থেকেই আসতে বলছিলাম, ছুটি পায় না আসতে পারে না। ব্যাংকের চাকরি ছুটিছাটা কম। সাতদিনের ছুটি নিয়ে এসেছে। আমি এখানে এসেছি দু'বছর আগে। ছেলে প্রথম এল। আমরাও খুব খুশি।

রাত্রিবেলা বেশ গল্পগুজব করছি। সিরাজউদ্দিন এসেছে। সাপের গল্পটল্প করছে। রাত দশটার দিকে সিরাজউদ্দিন চলে যেতেই ছেলে যেন কেমন হয়ে গেল। থরথর করে কাঁপছে। মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে। কোনোমতে বলল, তার নাকি অসম্ভব ভয় লাগছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে স্বাভাবিক হয়ে গেল। হাসি-তামাশা করতে লাগল। তখন কিছু বুঝতে পারিনি, এখন বুঝছি ঐ রাতেই তার পাগলামির প্রথম শুরু।

প্রিন্সিপাল সাহেব চুপ করলেন। আমি নিশ্বাস বন্ধ করে শুনছি। আমার শরীর দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে যাচ্ছে। পিপাসায় বুক শুকিয়ে কাঠ। প্রিন্সিপাল সাহেব বললেন, কয়েকদিন পর আবার এরকম হলো। সেও রাতের বেলা। কলেজের কিছু প্রফেসরকে খেতে বলেছিলাম। তাঁরা খাওয়াদাওয়া করে চলে যাবার পর আবার আমার ছেলে ঐরকম করতে লাগল।

আমি ক্ষীণস্বরে বললাম, সিরাজউদ্দিন সাহেবেরও দাওয়াত ছিল ?

'হ্যাঁ ছিল। কলেজ স্টাফের সবাইকে বলেছিলাম।'

'তারপর কী হলো বলুন ?'

'আর বলার কিছু নেই। রোজই ওরকম হতে লাগল।'

'কখন হতো ?'

'রাত দশটা সাড়ে দশটা।'

আমি কোনো কথা না বলে পরপর দুটা সিগারেট শেষ করলাম। চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে, এখন আমার চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু যেতে পারছি না। আমি নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললাম, সিরাজউদ্দিন সাহেব কি প্রায়ই আসে নাকি এখানে ?

'আসে। আমার ছোট ছেলেটাকে প্রাইভেট পড়ায়। সিনসিয়ার লোক। রোজ সাতটার সময় আসে, রাত দশটা সাড়ে দশটার আগে যায় না।'

'আমি কি আপনার ছেলেটাকে একটু দেখতে পারি ?'

তিনি বেশ অবাক হলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আসুন আমার সঙ্গে। আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম। না গেলেই ভালো করতাম। সাতাশ আটাশ বছরের একটা ছেলে। দড়ি দিয়ে বাঁধা। কী যে অসহায় লাগছে। ছেলেটি আমার দিকে কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে। আমি বললাম, একে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। ঢাকায় নিয়ে চিকিৎসা করান।

'ঢাকাতেই তো ছিল। কোনোরকম উন্নতি হয় না। টাকার শ্রাদ্ধ। এখানে বরঞ্চ ভালো আছে। সিরাজউদ্দিনের সঙ্গে বেশ খাতির। সে এলে শান্ত থাকে। প্রায় স্বাভাবিক আচরণ করে।'

'তা-ই নাকি ?'

'জী। কয়েকদিন ধরে সিরাজ আসছে না। আপনাকে নিয়ে ব্যস্ত। তাই ছেলেটার উগ্র স্বভাব হয়ে গেছে। গত পরশু বঁটি নিয়ে তার মাকে কাটতে গিয়েছিল।'

'সিরাজউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে কথাটথা বলে ?'

'না, কথাটথা কিছু না। চুপচাপ থাকে, ও এলে খুশি হয় এইটা বুঝি। মুচকি মুচকি হাসে। সিরাজউদ্দিন গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে একেবারে শান্ত হয়ে যায়।'

আমি তাকিয়ে আছি ছেলেটির দিকে। সে গোঙানির মতো একটা চাপা শব্দ করছে। মুখ থেকে অনবরত লালা বেরুচ্ছে। মুখ ঈষৎ হাঁ হয়ে আছে। একটু আগেই তাকে অসহায় লাগছিল, এখন সেরকম লাগছে না। বরং কেমন যেন ভয়ংকর লাগছে।

আমি ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বললাম, প্রিন্সিপাল সাহেব, আমাকে আজ রাতেই ঢাকা চলে যেতে হচ্ছে।

'কী বললেন ?'

www.BDeBooks.Com

'আমি কিছুতেই থাকতে পারছি না। কেন পারছি না সেই কারণও আপনার কাছে ব্যাখ্যা করতে পারছি না। কোনোদিন পারব বলেও মনে হয় না।'

'আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আপনি পরীক্ষা কয়েকদিন পিছিয়ে দিন। নতুন এগজামিনার এসে বাকিটা শেষ করবে।'

'অসম্ভব কথা আপনি বলছেন।'

'তা বলছি। কিন্তু আমাকে যেতেই হবে।'

সেই রাতেই আমি ঢাকা চলে আসি। এই অস্বাভাবিক ঘটনাটি স্মৃতি থেকে পুরোপুরি মুছে ফেলি। নিজেকে বোঝাই যে সমস্তটাই ছিল উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা। গ্রামে নির্জনতা কোনো-না-কোনোভাবে আমাকে প্রভাবিত করেছিল।

এই ঘটনার প্রায় চার বছর পর সিরাজউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা। আমি তাঁকে চিনতে পারিনি। তিনি বায়তুল মোকাররমের ফুটপাত থেকে উলেন সোয়েটার কিনছিলেন। তিনি আমাকে দেখতে পেয়ে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন।

'স্যার, আমাকে চিনতে পেরেছেন ? আমি সিরাজ।'

'চিনতে পেরেছি।'

'ঐ বার স্যার কাউকে কিছু না বলে হুট করে চলে এলেন। পরীক্ষা এক মাস পিছিয়ে গেল। কী দুর্দশা ছাত্রদের। গরিবের ছেলেপুলে।'

আমি কঠিন স্বরে বললাম, আপনারা সবাই ভালো তো ?

'জী ভালো।'

'প্রিন্সিপাল সাহেব, উনি ভালো আছেন ?'

'উনার খবরটা জানি না। ছেলেটা মারা যাওয়ার পর চাকরি ছেড়ে দিয়ে জামালপুর চলে গেলেন।'

'ছেলেটা মারা গেছে বুঝি ?'

'জী, বড়ই দুঃখের কথা। পাগল মানুষ বাড়ি থেকে বের হয়ে কোথায় চলে গেল। নানান জায়গায় খোঁজাখুঁজি। তিন দিন পর নদীতে লাশ ভেসে উঠেছে। আমিই খুঁজে পাই। আমার বাড়ির পাশের ঘাটে গিয়ে লেগেছিল।'

'তা-ই বুঝি ?'

'জী স্যার। খুবই আফসোসের কথা।'

'এখন কি নতুন প্রিন্সিপাল এসেছেন ?'

'জী, খুবই ভালো লোক। প্রায়ই যাই উনার বাসায়। আমাকে খুব আদর করেন। উনার সঙ্গে গল্পগুজব করি।'

'খুবই ভালো কথা।'

'তবে স্যার অদ্ভুত ব্যাপার কী জানেন ? নতুন প্রিন্সিপাল সাহেবের স্ত্রী মাঝে মাঝে বিনা কারণে ভয় পেয়ে চিৎকার চ্যাঁচামেচি করেন। অবিকল আগের প্রিন্সিপাল সাহেবের ছেলের মতো অবস্থা। মনে হয় বাড়িটার একটা দোষ আছে।'

আমি কঠিন চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সিরাজউদ্দিন বলল, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে বড় ভালো লাগছে স্যার। আপনার কথা আমার প্রায়ই মনে হয়।

সিরাজউদ্দিন হাসল। তার হাসিতে শিশুর সারল্য। চোখ দুটি মমতায় আর্দ্র।

---

www.BDeBooks.Com

BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com